দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ২২ আগস্ট ২০১৬।। ৫ ভাদ্র - ১৪২৩।।
যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

জাকিরদের ভাষা দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর

... পৃঃ ১২

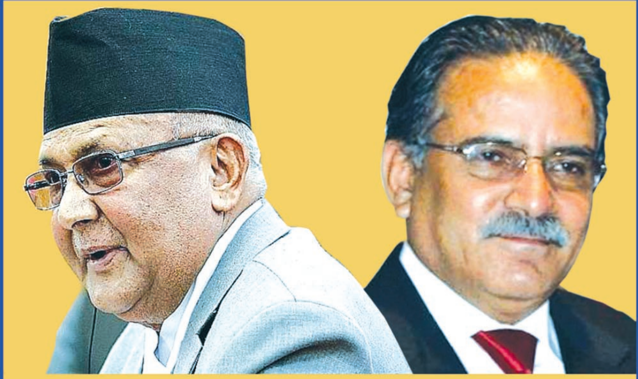

নেপাল
এবার কোন পথে ?

... পৃঃ ২৯

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হবে?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ৫ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২২ আগস্ট - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে ইটের জবাব পাথরে দেওয়ার নৈতিক সাহস দেখিয়েছেন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : ভাইয়েরা দামাল, দিদি বেসামাল
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

জাকিরদের ভাষা দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর
▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১২

সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিলবে কি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে
▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৪

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থেকে দেশের সম্মাননীয় নাগরিক
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৭

ভারতের পক্ষে এম এন রায় - মেক্সিকো সম্পর্কের স্মরণ বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ২০

মাদুরাইয়ের কাছে উদ্ধার প্রাচীন নগরী
▯ চিন্ময় ভট্টাচার্য ▯ ২১

মানবজাতির প্রথম আইন প্রণেতা মনু
▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ২২

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারক রূপে রবীন্দ্রনাথ
▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

চরমপন্থী ইসলামকে সামলানোর পথ কী?
▯ চেতন ভগত ▯ ২৭

যুগসন্ধিক্ষণে নেপাল : এবার কোন পথে?
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ২৯

কেন দরকার ভারতের নয়া শিক্ষানীতি
▯ টি এস আর সুব্রহ্মনিয়ন ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নমামি গঙ্গে

গঙ্গা ভারতবর্ষের জাতীয় নদী। এক পুণ্যপ্রবাহ। অথচ আমাদেরই দোষে সেই গঙ্গার জল আজ দূষিত, ক্লেদাক্ত। সেই গঙ্গার ধারা অবিরল ও নির্মল রাখতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে— 'নমামি গঙ্গে।' আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টিই নানা দিক থেকে তুলে ধরা হবে। লিখবেন— অম্লানকুসুম ঘোষ, অর্ণব নাগ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে : দশ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে সন্ত্রাস সৃষ্টির নেপথ্য কারিগর

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই পাকিস্তান কাশ্মীর লইয়া আগুনখেলা শুরু করিয়াছে। তিনবার যুদ্ধে সমুচিত শিক্ষা পাইয়াও ছায়াযুদ্ধ চালাইয়া ভারতকে ব্যতিব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস ত্যাগ করে নাই। ভারতের বীরযোদ্ধা সৈনিকরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে তাহাদের প্রতিরোধে সদা তৎপর রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীপদে শপথ লইয়াই নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তান-সহ প্রতিবেশী দেশগুলির নিকট আহ্বান রাখিয়াছিলেন, যুদ্ধ নয়, সন্ত্রাস নয়, যুদ্ধ করিতে হইবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান সেই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ভারতে অস্থিরতা সৃষ্টি তাহারা জারি রাখিয়াছে।

গত সপ্তাহেই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সার্কগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠকে পাকিস্তানে যাইয়া সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ দেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া কথা শুনাইয়াছেন। সন্ত্রাসবাদীকে শহিদের মর্যাদা না দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর বিষয়ে তাহাদের মনোভাব একবিন্দুও বদল করিতে রাজি নয়। গত ১৪ আগস্ট তাহাদের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাশে থাকিবার কথা ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের এই বছরের স্বাধীনতা দিবসটি কাশ্মীরে আজাদির জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বালুচপ্রদেশ এবং অধিকৃত কাশ্মীরের অবস্থা লইয়া আক্রমণ শানাইয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে গিলগিট ও বালটিস্তানে পাকিস্তানের জবরদখলকে তিনি বেআইনি হিসেবেই চিহ্নিত করিয়াছেন। 'কাশ্মীরে ভারত দমনপীড়ন চালাইতেছে' বলিয়া পাকিস্তান বিশ্বের দরবারে অভিযোগ জানাইতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট, বালটিস্তান এবং পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীকে অবহিত করাইয়াছেন। স্বভাবতই বালুচিস্তান তাহাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতকে পাশে পাইতে চাহিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সাধুবাদ জানাইয়াছেন। বালুচ সংগঠনগুলি আশা প্রকাশ করিয়াছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেমন মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেইরূপ বালুচিস্তানের পাশে দাঁড়াইবেন। ওয়ার্ল্ড বালুচ উইমেনস ফোরামের সভানেত্রী নইলা কাদরি বালুচ বালুচিস্তান ও পাক অধিকৃত মানুষের পক্ষে নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন—আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে মোদী বিষয়টি উত্থাপন করিবেন। বস্তুত পাকিস্তান একটি অন্তঃসারশূন্য দেশে পরিণত হইয়াছে। জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদ ছাড়া তাহাদের আর কিছুই নাই। নিজের দেশেই তাহারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ভারতবিরোধী জেহাদের পাঠ তাহারা শিশুদের পড়াইতেছে। নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতা আড়াল করিবার জন্যই তাহারা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সর্বপ্রকারে মদত দিয়া চলিতেছে। খবরে প্রকাশ, গত ১৩ আগস্ট পাক-অধিকৃত গিলগিট ও বালুচিস্তানের হাজার হাজার মানুষ পাকসেনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইতে শুরু করে। মিছিল হইতে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান উঠিয়াছে। ইহার জন্য পাঁচশত যুবককে পাক-কর্তৃপক্ষ জেলে পুরিয়াছে।

সীমান্তে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন পূর্বে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়াছেন। তিনি পাকিস্তানের ভণ্ডামি সামনে লইয়া আসিবার হুঁশিয়ারি দিয়াছেন। তিনি কাশ্মীরি যুবকদের হাতে গ্রেনেড নয়, পাথর নয়, ল্যাপটপ তুলিয়া লইতে বলিয়াছেন। দেশের উন্নয়নযজ্ঞে তাহাদের শামিল হইতে বলিয়াছেন। কাশ্মীরে হিংসা ছড়ানোর নেপথ্য কারিগর যে পাকিস্তান তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মামনুন হুসেন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন জানাইয়াছেন। ভারতে পাক হাইকমিশনার আব্দুল বাসিতও দিল্লীতে বসিয়া একই সুরে কথা বলিয়াছেন। ভারতের বিদেশসচিব বিকাশ স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর জবাব দিয়াছেন—'পাকিস্তান সন্ত্রাস, মাদক, জালনোট এসবই রপ্তানি করে। সবাই তাহাদের এই চিরাচরিত রপ্তানি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।' হাওয়া বিপরীত দিকে বহিতে শুরু করিতেছে দেখিয়া পাক-নেতৃত্ব ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে সন্ত্রাস বন্ধ না করিলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা সম্ভব নহে। ঢিল মারিলে পাটকেল খাইতে হইবে—পাকিস্তানের তাহা মনে রাখা দরকার।

সুভাষিতম্

ন হি কশ্চিৎ বিজানাতি কিং কস্য শ্বো ভবিষ্যতি।
অতঃ শ্বঃ করিণীয়ানি কুর্যাদদ্যৈব বুদ্ধিমান।।

আগামীকাল কী হবে কেউ জানে না। সেজন্য আগামীকালের জন্য কাজ ফেলে না রেখে আজই যিনি করেন তিনি বুদ্ধিমান।

পাক-সন্ত্রাসীদের গোপন প্রবেশপথের সন্ধান দিল ধৃত লস্কর জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এতদিন এটা জানা ছিল পাকিস্তান ভারতে জঙ্গি ঢোকায়। কিন্তু কোন পথে তারা আসে বা ফিরে যায় সেটা জানা ছিল না। সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এন আই এ) গোয়েন্দারা লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি বাহাদুর আলিকে জেরা করে সন্ত্রাসবাদীদের গমনাগমন সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে পেরেছে। ধৃত জঙ্গি জানিয়েছে, কীভাবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট (পড়ুন পাকিস্তানি) সন্ত্রাসবাদীরা ভারত-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর দুর্গম পথে ভারতে প্রবেশ করে।

বাহাদুর আলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তদন্ত করে এন আই এ এবং ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গোপন রুটের সন্ধান পেয়েছেন। এই রুটে প্রায় সব উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের জঙ্গিরা উত্তর কাশ্মীরে প্রবেশ করে। এরপর শুরু হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বনবাস। কোন কোন জঙ্গলে জঙ্গিরা সাধারণত লুকিয়ে থাকে এবং সেই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীরা কীভাবে খাবার আর আশ্রয় দিয়ে তাদের সাহায্য করে তাও জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। বস্তুত জঙ্গিদের পুরো মোডাস অপারেন্ডিটাই এসে গেছে গোয়েন্দাদের মুঠোয়।

একুশ বছর বয়েসী বাহাদুর আলি হাফিজ সইদের জামাতা খালিদ ওয়ালেদের অনুগামী। তার ওপর ভার ছিল কাশ্মীরের রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ার। লস্কর জঙ্গি শিবিরে প্রশিক্ষণ শেষ করে সে আরও দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে জুন মাসের ১১-১২ তারিখ নাগাদ ভারতে প্রবেশ করে। বাহাদুরের নিজের ভাষায়, 'আমাদের প্রত্যেককে ২০টা করে রুটি, বাদাম, জামাকাপড়, কম্পাস, জিপিএস, ওয়ারলেস সেট, একটা করে এ কে ৪৭, তিরিশ রাউন্ড ফায়ার করার মতো গুলি দেওয়া হয়েছিল। খরচের জন্য প্রত্যেককে ৩০,০০০ টাকা আর আমাকে আলাদা করে ২৩,০০০ টাকা দেওয়া হয়।'

গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গেছে প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা আর বিকেলে ৫টা থেকে প্রায় মাঝরাত অবধি হেঁটে জঙ্গিরা জুনের ২০-২১ তারিখ নাগাদ ওয়াদার গ্রামে পৌঁছয়। সেখানেই ফোনে তাদের প্রকৃত গন্তব্য সম্বন্ধে জানানো হয়। পরিকল্পনা মতো জুনের ২২ তারিখে বাহাদুর আলি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার শুরু হয় জঙ্গলবাস। যদিও এই সময় লস্করের ভারতীয় এজেন্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। লস্করের পাকিস্তানি কন্ট্রোল রুম থেকে তাকে জানানো হয় আরও চারজন জঙ্গি খুব শীগগির তার সঙ্গে যোগ দেবে। বাহাদুরের দাবি ওই চারজনের মধ্যে একজনকে সে পাকিস্তানে থাকতেই চিনত।

এত বড়ো সাফল্যে এন আই এ-র গোয়েন্দারা স্বাভাবিক ভাবেই উল্লসিত। তাদের আশা বাহাদুর আলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এরপর আরও সহজ হবে।

জাকিরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন বছরে ৬০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত তিন বছরে ইসলামের প্রচারক জাকির নায়েকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ষাট কোটি টাকা জমা পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশ থেকে আসা এই বিপুল অর্থের প্রেরকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। মুম্বই পুলিশের তদন্তে সম্প্রতি উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জাকির নায়েকের নামে না পাঠিয়ে সব টাকা পাঠানো হয়েছে তারই পরিবারের পাঁচ সদস্যের নামে। পরে তা জাকিরের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হয়। গোটা প্রক্রিয়াটি যে বেশ রহস্যজনক তা মানছেন তদন্তকারীরা। এক সদস্যের কথায়, 'কী উদ্দেশ্যে এই টাকা পাঠানো হয়েছে আমরা এখনও জানি না। জাকিরের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা এই টাকার সন্ধান পেয়েছি। জানতে পেরেছি টাকাটা সরাসরি জাকিরের নামে না পাঠিয়ে পরিবারের পাঁচ সদস্যের নামে পাঠানো হয়েছে।' রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে কারণ ওই পাঁচ সদস্য টাকাটা জাকিরের এনজিও ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা না করে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাকির নায়েক এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আর্থিক লেনদেন এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত মুম্বই পুলিশের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে খুব শীগগির ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কাছে এই হিসাব-বহির্ভূত আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে।

এদিকে, জাকিরের এনজিও ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কোনওভাবে বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও বাকি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আপাতত 'শিক্ষামূলক এনজিও' হিসেবে পঞ্জীকৃত ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং আই আর এফ এডুকেশনাল ট্রাস্ট বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রক আইন অমান্য করেছে কিনা তাই খতিয়ে দেখছে। অন্যদিকে মুম্বই পুলিশ জাকিরের প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক স্কুলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করা শুরু করেছে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে অনলাইন আর্থিক লেনদেন এবং যেসব দেশ থেকে সাধারণত টাকা আসে সেখানকার সঙ্গে জাকিরের সম্পর্কের মতো বিষয়গুলি।

ধৃত জঙ্গির ভিডিও বয়ান প্রকাশ্যে

কাশ্মীরিদের মধ্যে মিশে সেনাকে আক্রমণের ছক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভারতকে অশান্ত করতে পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রমাণ হাতে-নাতে উপস্থিত করল জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ। গত ১০ আগস্ট তাদের পক্ষ থেকে ধৃত পাক-জঙ্গি বাহাদুর আলি ওরফে সইফুল্লার একটি ভিডিও বক্তব্যকে প্রকাশ্যে আনা হয়। যাতে সইফুল্লা স্বীকার করে নেয় যে পাক সেনাবাহিনী নিয়মিত

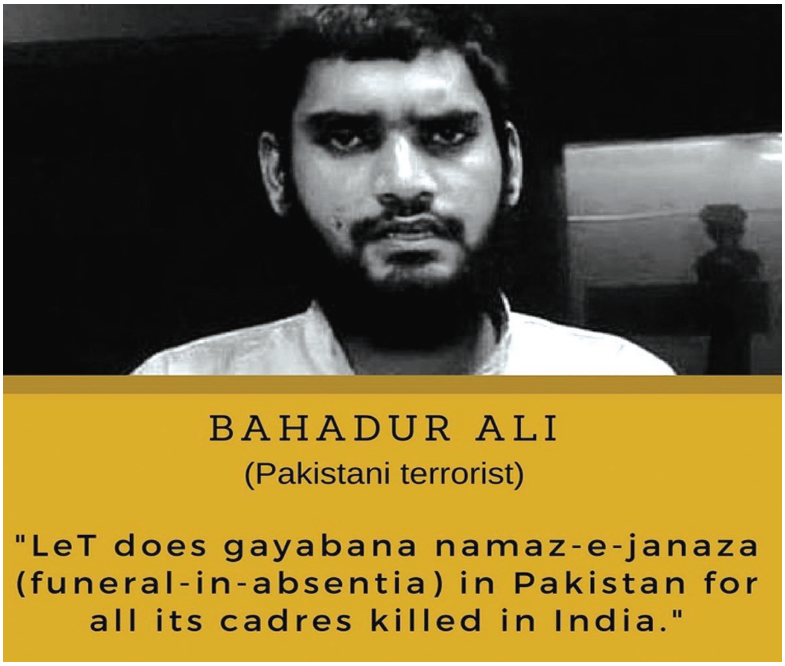

জঙ্গি সংগ্রহের কাজ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে। পরে এই প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জঙ্গিদেরই 'ফিঁদায়ে' হিসাবে ভারত ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা করতে পাঠানো হয়। ভিডিয়োতে এও দেখা যায় যে জেরায় ধৃত জঙ্গিটি কবুল করছে যে, সাম্প্রতিককালে জম্মু-কাশ্মীরকে অশান্ত করার ছক কষে পাক সেনা, বিশেষ করে এদের মূল লক্ষ্য এদেশের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। ধৃত জঙ্গির এই ধরনের ভিডিও বক্তব্য এন আই এ-র তরফে প্রকাশ্যে আনার ঘটনা এই প্রথম। প্রসঙ্গত, এই বছরের মার্চে পাকিস্তানের বালুচিস্তানে ধৃত ভারতীয় নাগরিক কুলভূষণ যাদবের ভিডিয়ো বক্তব্য প্রকাশ্যে আনে। ভারতের হয়ে পাকিস্তানে চরবৃত্তি করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও এর পুরোটাই পাকিস্তানের ভারতকে অপদস্থ করার কৌশল ও সাজানো নাটক হিসাবে দেখছেন কূটনীতিকরা। সইফুল্লাকে জেরা করে ভারতীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। তাদের পরিকল্পনামাফিক অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা মিশে যাচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকদের ভিড়ে এবং এরাই এদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর শিবির লক্ষ্য করে হ্যান্ড-গ্রেনেড পাথর ইত্যাদি ছুঁড়ছে। একপ্রকার দেশবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ও সংবাদমাধ্যম একে ভারতের সেনাবাহিনীর কাশ্মীরিদের ওপর অবিচারের প্রতিবাদ ইত্যাদি কাল্পনিক গল্প খাড়া করে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে পরোক্ষে মদত দিয়ে চলেছে। তদন্তে উঠে এসেছে মুজফফরাবাদ থেকে লস্কর কম্যান্ডার ভারতে এই জঙ্গিপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

'পাকিস্তান সরলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান' : বালুচনেতা

বালুচ নেতা বাবা জান।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গিলগিট-বালটিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (জিবিএনসি) প্রধান হাসান সেরিং বলেছেন, 'অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান সরলে তবেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তান অঞ্চল এখন রাজনৈতিক নেতা বাবা জানের মুক্তির দাবিতে উত্তাল। প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ছে জনরোষ। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাসান সেরিং বলেছেন, 'কাশ্মীরের এই অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তাকে আমরা স্বাগত জানাই।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত যেন পাকিস্তানকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা দখলদার ছাড়া আর কিছু নয়। পাকিস্তানকে যদি কাশ্মীর থেকে হটানো যায় তবেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে।' বাবা জানকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে পাক সরকার বন্দি করে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ২০১০ সালে আটাবাদে রাজনৈতিক দাঙ্গা করিয়েছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হলো ওই বছরের জানুয়ারি মাসে যে বিস্ফোরণ হয় তাতে বহু লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন। বাবা জান তাদের পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে পাক সরকার তাঁকে শাস্তি দেয়।

ভারতের স্বার্থ বিরোধী কেরলের স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড নামে কেরলের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীসংস্থা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফেসবুকে এক কুইজ প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জয়ী প্রতিযোগীদের 'গিফট ভাউচারস' দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় সবাই যোগ দিতে পারবেন। তাই ৭ থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করুন। ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ লোক 'লাইক' করেছে বলে জানা গেছে। যদিও পরে ফেসবুক পেজ থেকে এই বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে মালাবার গোল্ডের মার্কেটিং ডাইরেক্টর আমজেদ হুসেন জানিয়েছেন, আরব দেশগুলিতে তাঁদের ব্যবসা রয়েছে। এক ইন্টার ন্যাশনাল এজেন্সি কোম্পানির মার্কেটিং দেখে থাকে। তারা ব্যবসার জন্য বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ ঠিক করে। সম্প্রতি ফিলিপিন্সে এভাবে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হয়েছে। আর এই সাফল্যের জন্য মার্কেটিং এজেন্সি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

অন্যদিকে মৈত্রী অ্যাডভারটাইজিং ডাইরেক্টর রাজু মেনন বলেন, আরব দেশগুলিতে ভারতীয়দের মধ্যে বহু মালয়ালিও বাস করেন। মালাবার ডায়মন্ডের মতো বড় কোম্পানি নিশ্চয়ই সব দিক দেখেশুনেই এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কাশ্মীরের অশান্ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে একজন ভারতীয় হিসেবে মনে করি, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া ঠিক হয়নি। এই বিজ্ঞাপন ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী।

মহিলা বিলের মতো নাগরিকত্ব বিলও সিলেক্ট কমিটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিরোধীদের বক্তব্যকে সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-র সংশোধনী বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকত্ব বিলের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে সংসদের আগামী শীতকালীন অধিবেশনে। এ নিয়ে অনেকেই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। প্রশ্ন উঠেছে, নানা ছলছুতোয় বিলের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার করে দিতে চাইছে বিরোধীরা? ঐকমত্যের দোহাই দিয়ে নাগরিকত্ব বিলকেও মহিলা বিলের পংক্তিতে ফেলে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হচ্ছে কি?

সম্প্রতি ভারতীয় জনতা দলের ভর্তৃহরি মহতাব বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানোর দাবি জানিয়ে বলেন, বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত বিভিন্ন ধর্মের অত্যাচারিত মানুষদের আশ্রয় দিয়ে আসছে। সুতরাং এরকম একটি বিল অনুমোদন করার আগে সব পক্ষের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। তাকে সমর্থন করেন কংগ্রেসের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের মহম্মদ সেলিম। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, বিরোধীরা বিলটি সমর্থন করতে চায়। কিন্তু তার আগে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, যদি সকলেরই এক মত হয় তাহলে গণতান্ত্রিক রীতি মেনে বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠাতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ১৮ মে অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈকে লেখা এক চিঠিতে প্রধান প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্পষ্ট বলেছিলেন, "হিন্দু শরণার্থী ও মুসলমান অভিবাসীর মধ্যে আপনাকে অবশ্যই পার্থক্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এই শরণার্থীদের দায়িত্ব অবশ্যই দেশকে গ্রহণ করতে হবে।" দেশভাগের সময় পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে আশ্বাস নেহরু-সহ অন্য জাতীয় নেতারা দিয়েছিলেন তা কি কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা এড়াতে পারেন?

অঙ্গদানের অঙ্গীকার বি এস এফ জওয়ানদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বি এস এফের বীর জওয়ানরা মৃত্যুর পরেও মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার করলেন। গত ১৩ আগস্ট দিল্লীতে 'ন্যাশনাল অরগান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন' (এন ও টি টি ও) আয়োজিত এক সভায় বি এস এফের ১৫০০ জওয়ান তাঁদের অঙ্গদানের অঙ্গীকারপত্র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে পি নাড্ডার হাতে অর্পণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বি এস এফের এই মহান মানসিকতা বিষয়ে বলেন, ''তাঁদের এই সংকল্পকে তিনি স্যালুট জানাচ্ছেন। এটি দেশে অঙ্গদানের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বি এস এফ জওয়ানরা গত ৫০ বছর ধরে অতন্দ্র প্রহরীরূপে দেশের সীমানা রক্ষা করে চলার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন এ অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।''

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অঙ্গদান জীবনকে এক নতুন উপহার দেওয়ার সমান। অঙ্গ হলো জাতীয় সম্পদ, একে নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়। তিনি দেশবাসীকে মৃত্যুর পর তাঁদের অঙ্গ দান করার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান। শ্রী নাড্ডা অঙ্গদানের সরকারি নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করেন। অন লাইনে অঙ্গদানে অঙ্গীকার রেজেস্ট্রি করার জন্য www.notto.nic.in সুবিধা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে জানান।

উবাচ

"ভারত এতদিনে পাকিস্তানের অনেক টেডমার্ক রপ্তানির সাক্ষী থেকেছে—আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, সীমান্তে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র, মাদক, জাল টাকার রপ্তানি। এটাই যথেষ্ট, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

বিকাশ স্বরূপ
ভারতের বিদেশ সচিব

এ বছরের পাক-স্বাধীনতা দিবসকে কাশ্মীরের আজাদির নামে উৎসর্গ প্রসঙ্গে।

"আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ বাড়িতে রান্নার গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে যাবে।"

ধর্মেন্দ্র প্রধান
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

কলকাতায় 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

"দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। কিন্তু ভারত গত দু-বছর থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি করেই চলেছে।"

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ে এক ভাষণে।

"আমরা বালুচিস্তানের মানুষ বহু যন্ত্রণার শিকার। আমরা আশা করি আপনি (মোদী) এবার এই ইস্যুটি আগামী সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে উত্থাপন করবেন।"

নইলা কাদরি,
ওয়ার্ল্ড বালুচ উইমেন ফোরামের সভানেত্রী

এক সাক্ষাৎকারে।

"এস পি যদি ক্ষমতায় আসে তবে তারা বিশেষ জাতপাতের জন্য কাজ করবে আর বিএসপি যদি ক্ষমতায় আসে তবে শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য কাজ করবে— অন্য কারোর জন্য নয়।"

অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

উত্তরপ্রদেশে দলের নির্বাচনী অভিযানে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে ইটের জবাব পাথরে দেওয়ার নৈতিক সাহস দেখিয়েছেন

গূঢ় পুরুষের কলম

গত ১২ আগস্ট দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তান ১৯৪৮ সাল থেকে বালুচিস্তান প্রদেশে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত তুলে ধরবে। এই প্রথম ভারতের কোনো একজন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে নিপীড়িত বালুচদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর আগে শর্ম অল শেখের আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে বালুচিস্তানে ভারতের মদতেই জঙ্গি হামলা চলছে। মনমোহন সিং পাকিস্তানের কূটকৌশলের মোকাবিলায় চরম ব্যর্থ হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ পোড়ান। মনমোহন সিং সাহসের অভাবেই দেশকে ডুবিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের কূটনৈতিক চাপের কাছে নতজানু হননি। ইটের জবাব পাথরে দেওয়ার নৈতিক সাহস দেখিয়েছেন। তাই ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস দৈনিকের হেডিং করা হয়েছে, ‘‘মোদীর ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতির প্রমাণ তিনি দিয়েছেন।’’ ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছরে পদার্পণের মাসে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

কাশ্মীরে সাম্প্রতিক অশান্তির সুযোগ নিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে শুরু করে সর্বত্র কাশ্মীরে ভারতের ‘অত্যাচার’ নিয়ে সরব হয়েছেন। শরিফ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুনকে চিঠি লিখে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। কিন্তু পাক প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ খারিজ করে শ্রী মুন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধৃত লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি নেতা বাহাদুর আলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন। এর ফলে পাকিস্তান কিছুটা চাপে পড়েছে। ইতিমধ্যে বালুচিস্তানের দুই প্রধান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হামাল হায়দার এবং নইলা বালুচ তাঁদের ই-মেল বার্তায় লড়াকু বালুচদের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর জন্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ১৯৪৮ সাল থেকে বালুচদের আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই চলছে। এই প্রথম ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী বালুচদের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে স্বীকৃতি দিলেন। মনে রাখতে হবে যে গত আট বছরে বালুচিস্তানে পাক সেনা আট হাজার বালুচকে স্রেফ সন্দেহের কারণে হত্যা করেছে। এর মধ্যে একমাত্র ২০০৮ সালেই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় ১১০২ জন বালুচ নাগরিককে। এই ব্যাপারে পাক সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন হতভাগ্যদের পরিবার পরিজনেরা। পাক সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি তার রায়ে ঘোষণা করেছে যে নির্বিচারে বালুচদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য তখনকার সামরিক একনায়ক পারভেজ মুশারফকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হোক। বালুচিস্তানে গণহত্যা চালাতে আকাশপথে পাক বিমানবাহিনী ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করে।

পাক সেনার অত্যাচার ও সন্ত্রাস রুখতে এখন বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য পাক সেনা ছাউনি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন। এছাড়া সেখানে জঙ্গি লড়াইতে আছে বালুচ লিবারেশন ইউনাইটেড ফ্রন্ট। বালুচিস্তানে যে লড়াই চলছে তার তুলনা করা যেতে পারে শ্রীলঙ্কার প্রয়াত তামিল নেতা প্রভাকরণের তামিল টাইগারদের সশস্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ের সঙ্গে। তফাত শুধু শ্রীলঙ্কার তামিলদের লড়াই আন্তর্জাতিক মঞ্চে যে স্বীকৃতি পেয়েছিল তার এক শতাংশও বালুচরা পায়নি। আজও পাচ্ছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিতে তাই বালুচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এতটা আপ্লুত। বালুচরা বরাবরই গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার গড়ার পক্ষে। কিন্তু দেশভাগের পর পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থে নির্বাচিত সরকার গড়ার প্রয়াস সফল হয়নি। যখনই সে চেষ্টা হয়েছে তখনই সেনা প্রধানরা ক্ষমতা দখল করেছে। বালুচরা সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক প্রধানদের শাসন ক্ষমতা দখল করাটা মেনে নেয়নি। এর একটা অন্য কারণও আছে। পাক সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবিদেরই একছত্র প্রাধান্য। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই হচ্ছে পাঞ্জাবিরা। বৃটিশ ভারতে বালুচ রেজিমেন্টের সামরিক খ্যাতি থাকলেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে নেই। তাছাড়া পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই বালুচদের কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে দেওয়া হয়। বর্তমানে পাকিস্তানের সবচেয়ে অবহেলিত প্রদেশ হচ্ছে বালুচিস্তান। প্রায় ৮০ শতাংশ বালুচ সেখানে এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পাকিস্তানের এই প্রদেশের মানুষের এমনটি হওয়ার কথা নয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার বালুচিস্তান থেকে গ্যাস নিয়ে পাক সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা করছে। বিনিময়ে বালুচিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে ইসলামাবাদ রয়্যালটি দেয় ১৯৫৩ সালের রেটে। এই আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে বালুচদের গুলি করে হত্যা করা হয়। বালুচিস্তানে ঘটে চলা গণহত্যার সঠিক চিত্রটি নরেন্দ্র মোদী বিশ্বসাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। স্বাধীনতার ৭০ তম বর্ষে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

খোলা চিঠি

ভাইয়েরা দামাল, দিদি বেসামাল

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
নবান্ন, হাওড়া

শুভ কর্মপথে নির্ভয়গান ধরাই রীতি। মুখ্যমন্ত্রী দিদি আপনি সেই গান গানই ধরেছেন। আপনার আবার একটা প্রিয় গান হলো—একলা চলো রে...। কিন্তু সরকার এবং দল তো আর একা চালানো যায় না। ভাইদের নিয়েই চালাতে হয়। কিন্তু ভাইয়েরা বড়ই দামাল। অনেকে বলে আপনার প্রশ্রয়েই দামাল হয়েছে। এখন চাইলেও আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। কেউ না বুঝুক আপনার সদিচ্ছাটা আমি বুঝি।

অনেকদিন থেকেই আপনি দলের ও সরকারের মধ্যে তালভঙ্গকারী চপলদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে আসছেন, অপরাধীদের ক্ষমা করে জনাদেশকে অসম্মান করতে চান না। এই মর্মেই বারেবারে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাইছেন। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসেই নানাবিধ সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বার্তা দিচ্ছেন নিজের দলের নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কদের। কিন্তু দিদি আপনার ইচ্ছা ও কাজের সঙ্গে আপনার ভাইদের মানে দলীয় কর্মীদের ইচ্ছা-কাজ একই ভূমিতে অবস্থান করছে না। নানাদিকে তার প্রমাণ। তোলাবাজি বা সিন্ডিকেটের গভীর কালো ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে। কোথাও জলাজমি ভরাট করে প্রোমোটিং হচ্ছে। কোথাও তোলা উত্তোলনের দাবি। কোথাও অসামাজিক কাজকর্মের রমরমা। কোথাও অভব্যতা, উগ্রতা। যাঁরা এইসব অসুখের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন, তাঁদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। এমনকী, খুনও করা হচ্ছে। ভাঙড়ে ভেড়ি ভরাটের প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীর উপর হামলা হয়েছিল। মদ, সাট্টা, জুয়ার প্রতিবাদ করে মেটিয়াবুরুজে খুন হয়েছেন একজন। তৃণমূল কাউন্সিলরের বেপরোয়া বাইক চালানোর প্রতিবাদ করে প্রহৃত হয়েছেন এক প্রতিবাদী। অন্যদিকে, আপনি টানা বলে চলেছেন, ''ক্রিমিনালস্ আর ক্রিমিনালস্।'' অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলছেন, ''আমি অন্যায় করলেও অ্যাকশন নেবে। আপনি অন্যায় করলেও অ্যাকশন নেবে।'' কিন্তু মুশকিল হলো এ রাজ্যের যুগলালিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পাপড়ির মধ্যেই অনৈতিকতার কীট বাসা বেঁধে রয়েছে। ফলে আপনি চাইলেও, বললেও সে নির্দেশও কোথাও কোথাও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম আমলে যে বস্তুটির সব থেকে বেশি অভাব ছিল, তা হলো, রাজধর্ম। 'রাজধর্ম' ব্যাপক একটি শব্দ। তার নানা অভিমুখ। কিন্তু বাম-আমলে শব্দটি কোনো দিক থেকেই রাজ্যের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না। এক সময়ে সিপিএম 'করা' মানেই ছিল স্বর্গের একচ্ছত্র অধিকার লাভ! যা ইচ্ছে তাই করার অপার ছাড়পত্র প্রাপ্তি!

এখনও সেই ধারাই চলছে। দিকে দিকে শাসকদলের নেতানেত্রীর যে দাদা ও দিদিগিরি চলছে, যে সন্ত্রাস চলছে, যে আগুন জ্বলছে, যে রক্ত ঝরছে—তাতে জনগণ সদা আতঙ্কিত। একজন সুশাসক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন, যে কোনো সুস্থ ও স্থিতিশীল রাজ্যে এহেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ একেবারেই কাম্য নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে দিদি! আপনার প্রশ্রয়ে লাগামহীন হয়ে যাওয়া ভাইদের উপরে এখন আর রাশ কী করে টানবেন বলুন?

—সুন্দর মৌলিক

জাকিরদের ভাষা দেশের প্রগতির পথে ভয়ঙ্কর বিপদ

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমানে ঠাসা মুম্বইয়ের ঘিঞ্জি বস্তিতে এক উৎসবে সাতদিন ধরে এক মৌলবাদী মৌলবির সাম্প্রদায়িক কথাবার্তার ভিডিও দেখানো হচ্ছে। শরিয়তি আইন অনুসারে চারটে করে বিয়ে করা আর তাদের দাসি-বাঁদি বানিয়ে রাখার জন্য মারধোর করার অধিকার আছে মুসলমানদের; তোমাদের বিবিকে পেটাও, সমকামীদের খতম কর, পশ্চিমের দেশে ত্রাস সৃষ্টি করো, আধুনিক শিক্ষাকে পরিত্যাগ করো— এ রকম আরোও অনেক 'সদুপদেশ' একদল মুসলমান শ্রদ্ধামেশানো ভয়ে চোয়াল শক্ত করে নিথর হয়ে শুনছে আর এরকম আচরণ দেরি না করে এখনই করা উচিত বলে মনে মনে শপথ নিচ্ছে। সত্যিই হাড়হিম করা দৃশ্য!

মাত্র মাসখানেক আগেকার ঘটনা। 'পিস টিভি' নামে এক টেলিভিশান চ্যানেলে জাকির নায়েকের ভয়ঙ্কর উসকানিমূলক বিবৃতির জেরে দেশের গণমাধ্যম থেকে নাগরিক সমাজ রীতিমতো তোলপাড়। ফেসবুক ট্যুইটারের সৌজন্যে তার নাম এখন সবার মুখে মুখে। জাকিরদের এই ধরনের ভাষা বুঝতে মুসলমানদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। এ ভাষার অর্থ আজ বিশ্বের সব দেশের মানুষজন বিলক্ষণ বোঝেন। আমাদেরও বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবার কথা নয়। এক একটা উত্তেজক ভাষণ আর তারপর কিছু নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক হত্যা— এই ভয়ে আজ কাঁটা হয়ে থাকেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বিস্ফোরণ থেকে আমেরিকায় ছোট বড় অসংখ্য আত্মঘাতী হানা, ফ্রান্সে শার্লি এবদোর হত্যাকাণ্ড-সহ একাধিক জঙ্গি আক্রমণ, জার্মানির হামবুর্গের 'মর্জেনপোস্ট' সংবাদপত্রকে আক্রমণ কিংবা হালে বাংলাদেশের বিস্ফোরণ— এর কোনোটাই ভোলা যায় না। তেমনি, মুম্বই বিস্ফোরণ বা তাজ হোটেল আক্রমণের ক্ষত যা এখনও ভারতবাসীর মনে তাজা অবস্থায় আছে।

ইউরোপের সমাজ জুড়ে মৌলবাদী মুসলমানদের জন্য আলাদা আইনের দাবি থেকেই সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার শুরু। গত বছর জেহাদিরা একটি ভিডিওবার্তায় ইতালিকে হুমকি দিয়েছিল, "তোমাদের রাস্তায় হাঁটতে, ডানদিকে বাঁদিকে ঘুরতে দাম দিতে হবে, মুসলমানদের ভয় পাবে। আমরা আল্লার নির্দেশে তোমাদের রোম দখল করব, তোমাদের পবিত্র ক্রুশচিহ্ন ভেঙে দেব, তোমাদের মহিলাদের দাসী বানাব।" আর এক ফরাসি ইসলামি পণ্ডিত সম্প্রতি টেলিভিশন সুইসি বার্তায় বলেছেন, "তোমাদের ফ্রান্সে রোবাইক্স, উত্তর মার্সেইলির মতো ভূখণ্ড আছে যেখানে পুলিশ পা রাখবে না, যেখানে তোমাদের রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একেবারেই চলে না, সেখানে ক্ষুদ্র ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে।" অন্যদিকে বৃটিশ ইসলামি নেতা আনজেম চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—"কোরানে অ-মুসলমানদের জন্য দুঃখিত হবার অনুমতি নেই। আমি তার জন্য দুঃখিত নই। ঘটনাক্রমে সমগ্র বিশ্ব শরিয়তি আইন দ্বারা শাসিত হবে এবং মুসলমানরা চীন, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কর্তৃত্ব করবে। এটাই আল্লার আকাশবাণী।" তাই আজ জাকিরের হুমকি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা দুনিয়ায় মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই যে তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এ নিয়ে আজ কারও মনে বিন্দুমাত্র ধোঁয়াশা নেই। জার্মানির এক জাতীয়তাবাদী সংগঠন ফেসবুকে পোস্ট করেছিল— "ইসলামি...ফ্রান্সে দেখিয়ে দিয়েছে যে ওরা গণতন্ত্রে অক্ষম এবং ফলস্বরূপ তারা বরং আক্রমণ আর হত্যার পথ নিয়েছে। আমাদের রাজনীতিকরা এর উল্টোটা বিশ্বাস করাতে চায়।" ভারতের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ভোটব্যাঙ্কের হীনবৃত্তির কারণে ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থা দিনের পর দিন কীভাবে অবক্ষয়ের পথে তলিয়ে যাচ্ছে তা এখানকার মানুষজন অসহায় হয়ে দেখেন। এই রাজনীতিকরা ঘুরপথে ঘৃণ্য ও পিছিয়ে দেওয়া শরিয়তি প্রথাকে পন্থনিরপেক্ষ ভারতের মূলস্রোতে জায়গা করে দিতে চান। সেই অর্থে জাকিরদের ভাষা তাঁরাও 'তাঁদের মতন' করে বোঝেন।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকারের উর্দু শিক্ষক নিয়োগের প্রেক্ষাপটটি আজকের জাকিরের ঘটনার সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। মাস কয়েক আগে সরকার প্রাথমিকে ৩৫০০ উর্দু শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়, তাতে অতিরিক্ত যোগ্যতামান হিসেবে বলা হয় যে প্রার্থীদের বিয়ে- সংক্রান্ত তথ্য জানাতে হবে। যেসব পুরুষদের একাধিক জীবিত স্ত্রী থাকবে বা যেসব মহিলার স্বামীর একাধিক স্ত্রী বর্তমান তাঁরা ওই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একে ইসলামি আইনের পরিপন্থী এবং মুসলমানদের অধিকার ভঙ্গকারী বলে বিবৃতি দিয়ে এই আদেশের বিরোধিতা করে। আর এতেই

টলে যায় সরকার। সরকার রাতারাতি এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে জানায় যে আগেকার নিয়ম ও নির্দেশ মেনেই এই নিয়োগ হবে এবং এর কোনো পরিবর্তন হবে না। লক্ষ্ণৌয়ের ইদগা মৌলানা খালিদ রসিদ ফিরঙ্গি মহালি-র ইমাম মন্তব্য করেছেন, 'কর্মীনিয়োগে সরকার এরকম কোনো শর্ত আরোপ করতে পারে না। কেননা, ইসলামে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করার নির্দেশ আছে।' এই সব ঘটনা থেকে এই বিষয়টা বেশ স্পষ্ট হয় যে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সরকারের জারি করা কোনো আদেশ-নির্দেশও বদলাতে হবে যদি সেটি শরিয়তি আইনের পরিপন্থী হয়। মুসলমানদের সামান্য ঠেলাতেই আমাদের সংবিধানের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার শক্ত প্রাচীর আজ যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির স্বার্থ আমাদের বিবেকবোধকে এতটাই অসাড় করে দিয়েছে যে দেশের অখণ্ডতা আর সংবিধানের মৌলিক নীতিও মূল্যহীন হয়ে পড়ছে।

মুসলমান কেষ্টবিষ্টুর দল একসময় উর্দুভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও উর্দু কখনোই মুসলমানদের একচেটিয়া ভাষা ছিল না। মুসলমান পরিচয়ের সঙ্গে উর্দুকে অভিন্ন করে দেখানোর ফলে শুধু যে মুসলমানদের কট্টর মৌলবাদ আর আলাদা জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাই নয়, দেশের পরিবর্তন ও প্রগতির পথে তাদের এক ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি করে তোলা হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে শুধু রাজনৈতিক অভিসন্ধি সার্থক করার জন্য এই ঘৃণ্য বেসাতির কারণে উর্দুভাষা আজ শরিয়তি ইস্তেহারকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এক অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

সঙ্গত কারণেই ভারত সরকার জাকিরের বক্তব্য ও তার হাস্যকর 'পিস টিভি'র সম্প্রচারকে ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে সে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। কেননা, দেশে হাজার এক আইন আছে, আবার আইনের ফাঁক গলে বহু বেআইনি কাজ রমরমিয়ে চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কেবল সার্ভিস'-এ পিস টিভির সম্প্রচার করা হবে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে দেশের আনাচে-কানাচে মুসলমান বস্তিতে জাকিরের বক্তব্য পৌঁছবে না। জাকিরের ইসলামি ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা শোনার মতো উৎসাহী লোকের সংখ্যা কিন্তু এদেশে নেহাৎ কম নয়, তাদের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছে দেবার মতো লোক ও মাধ্যমও অনেক আছে।

"জাকিরের ইসলামি ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা শোনার মতো উৎসাহী লোকের সংখ্যা কিন্তু এদেশে নেহাৎ কম নয়, তাদের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছে দেবার মতো লোক ও মাধমও অনেক আছে।"

জাকিরের প্রভাব মুসলমান সমাজের নিচু তলাতেই সীমাবদ্ধ এমন ভাবাটা নিতান্ত বোকামি হবে। মুসলমান সমাজের সব স্তরেই তার বক্তব্য প্রভাব ফেলছে। ঢাকার বিলাসবহুল কফিশপে নরহত্যা ঘটানো বাংলাদেশি জেহাদিটি কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক। সে যথেষ্ট নামি-দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছে এবং 'শহিদের' পথ বেছে নেবার আগে বেশ বিলাসবহুল জীবনযাপনই করত। এটা প্রমাণিত, অন্তত দুজন গণহত্যাকারী জাকিরের বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়েছিল। কেউ কি বলতে পারেন ভারতে এই সংখ্যাটা কত?

বস্তুত, ইসলামি মৌলবাদের যে সর্বব্যাপী ব্যাধি আজ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, জাকির নায়েক তার একটা উপসর্গ মাত্র। ভারতবর্ষের মতো একটি রাষ্ট্র যা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে অবিচল থেকে এই উপসর্গের হাত থেকে মুক্ত নয়। আলাদাভাবে উর্দু শিক্ষক নিয়োগের সরকারি নীতি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষও জাকিরদের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে বেশ 'সদর্থক' ভূমিকাই নিয়ে থাকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিলবে কি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে?

ধর্মানন্দ দেব

সংসদের বাদল অধিবেশন গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। মোদী সরকার এই বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেই ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করেছে। ভারতের সংবিধানে সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ থেকে ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকত্বের কথা সন্নিবেষ্টিত রয়েছে। সংবিধানের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে ভারতের ভূখণ্ডে স্থায়ী বাসভূমি থাকা প্রতিটি ব্যক্তিই এবং (১) যাঁর জন্ম ভারতীয় ভূখণ্ডে অথবা (২) যাঁর মাতা বা পিতার মধ্যে একজনের জন্ম ভারতের ভূখণ্ডে অথবা (৩) দেশে সংবিধান লাগু হওয়ার আগে ভারতের ভূখণ্ডে সাধারণ বাসিন্দা হিসাবে ৫ বছরের কম সময় ধরে আছেন তাঁরাই ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন।

সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের সংসদের উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন, নাগরিকত্ব বাতিল এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের। আর সেই ক্ষমতার সুবাদেই ১৯৫৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংসদে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যেটির নাম— 'নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫'। অবশ্য সেই আইন পরে অনেকবার সংশোধনও করা হয়। শেষ সংশোধন করা হয়েছে ২০১৫ সালে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে কেন্দ্রকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে সরকারি রাজপত্রে (গেজেট) নোটিফিকেশন প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করার। তাই ২০০৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে একটি রুলস তৈরি করে তৎকালীন কেন্দ্র সরকার। ওই রুলসটির নাম হচ্ছে— 'The Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Card) Rules, 2003.' ওই রুলসে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জির (এন আর সি-র) কথা, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ইত্যাদি। একইভাবে ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি রুলস তৈরি করে তৎকালীন কেন্দ্র সরকার। ওই রুলসটির নাম— 'The Citizenship Rules, 2009.' এই রুলসে রয়েছে স্বদেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের (Citizenship by Naturalisation) আবেদনপত্র, আবেদন পরীক্ষণের কথা, প্রমাণপত্র প্রদান, দেশীয়করণের শপথ ইত্যাদি।

কবীন্দ্র পুরকায়স্থ

বলা বাহুল্য, সংসদে যেসব বিল সরকারের কোনো মন্ত্রী পেশ করেন তখন সেটাকে বলা হয় সরকারি বিল এবং যে বিল কোনো বিরোধী দলের সংসদ সদস্য পেশ করেন সেটাকে বলা হয় 'প্রাইভেট মেম্বার বিল'। নাগরিকত্ব নিয়ে উল্লেখিত বিলগুলি ছাড়াও সংসদের লোকসভায় একটি প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ হয় এবং সেটি পেশ করেন শিলচর লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ তৎকালীন বিরোধী দলের সদস্য কবিন্দ্র পুরকায়স্থ। বিলটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধন। যদিও বিলটি পাশ হয়নি বা কোনও আলোচনাই করেনি তৎকালীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। তবুও বলা যায় এটি কবিন্দ্রবাবুর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কেননা দেশের সংসদের ইতিহাসে মাত্র ১৪টি প্রাইভেট মেম্বার বিল পাশ হয়ে আইনে কার্যকর হয়েছে এবং ওই কার্যকর হওয়া বিলের মধ্যে লোকসভায় পেশ করা বিলের সংখ্যা মাত্র ৯টি এবং রাজ্যসভায় পেশ করা বিলের সংখ্যা মাত্র ৫টি। প্রথম প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসাবে ১৯৫২ সালের মুসলিম ওয়াকফ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় ১৯৫৪ সালের ২১ মে।

আর সর্বশেষ প্রাইভেট মেম্বার বিল ১৯৬৩ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির (সংশোধনী) বিল। ১৯৭০ সালের পর আর কোনো প্রাইভেট মেম্বার বিল সংসদে পাশ হয়নি। ষোড়শ লোকসভায় ২০৬টি প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ হলেও মাত্র ৬টি বিল নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু একটিও পাশ হয়নি।

যাইহোক, দেশের সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেওয়া ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সংসদে ২০১৬ সালের ১৭২ নম্বর বিল হিসাবে লোকসভায় ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল পেশ করেন। নতুন বিলে রয়েছে মোট ৪টি অনুচ্ছেদ। বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে— ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী হিন্দু, জৈন, খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সী এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত যারা হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই, পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্টের

মেয়াদ শেষ হওয়ায় তারা আইনের চোখে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। আর সেজন্য তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের অযোগ্য। ওই বাধা দূর করে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬। অফিশিয়াল গ্যাজেট নোটিফিকেশনে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই এই বিল দেশে কার্যকর হবে।

এখানে অফিসিয়াল গ্যাজেট বলতে বোঝানো হয়েছে সরকারি সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রেই পর্যায়ক্রমে সরকারি ঘোষণাপত্র, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় জনসাধারণের জন্য। ওই সংবাদপত্রের অন্য নাম হচ্ছে ভারতের রাজপত্র অর্থাৎ গেজেট।

লোকসভায় পেশ করা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬-র ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ২ (১) (খ) অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত হবে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সী এবং শিখ ধর্মাবলম্বী যাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন এবং এই মর্মে যে কোনো নির্দেশনামায়। তাদের ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন মোতাবেক আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী (Illegal Migrants) আখ্যা দেওয়া যাবে না।

সহজ কথায় বলা যায়, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সী এবং শিখ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাদের ভারতে থাকার প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র নেই, এমনকী পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে আর গণ্য হবেন না। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক বা ওইসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষেত্রে নতুন সংশোধনীতে কোনো লাভ হবে না। মনে করুন, ১৯৭৭ সালে 'রহিম' নামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাকাপাকিভাবে ভারতে বসবাস করে রুজি-রোজগার করছেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু এবং ভারতের সংখ্যালঘু। তখন ওই 'রহিম' নামের ব্যক্তিকে বলা হবে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী তারাই, যারা অত্যাচারিত বা নিপীড়িত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং পাকাপাকি ভাবে এদেশে বসবাস করার চেষ্টা করেছে। এই অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞায় পড়েছে বাংলাদেশি মুসলমানরা। যারা নিজেদের দেশে মোটেই অত্যাচারিত নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে হোক বা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই হউক ভারতে বসবাস করছে। তাকে আইনের চোখে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা হবে।

লোকসভায় পেশ করা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬-র ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৭ (ঘ) উপ-ধারার 'ঘ' উপধারার সঙ্গে সন্নিবেষ্ঠিত হবে উপধারা ঘ এবং ক। নতুন ওই উপধারা 'ঘ ক'তে বলা হয়েছে— বৈদেশিক (Oversea) নাগরিক ভারতীয় কার্ড হোল্ডাররা যদি ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন বা অন্য কোনো প্রযোজ্য আইনের ধারা লঙ্ঘন করেন তখন তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে।

মূলত ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে ২০০৪ সালে সংশোধন করে জুড়ে দেওয়া হয় ৭ নম্বর ধারার সঙ্গে। ৭ (ক) থেকে ৭ (ঘ) পর্যন্ত উপধারা এবং ওই উপধারাগুলিতে বৈদেশিক (Oversea) নাগরিক ভারতীয় কার্ড হোল্ডারদের রেজিস্ট্রেশন ও রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। আর সদ্য লোকসভায় পেশ করা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬-এ ৭ (ঘ) উপ-ধারার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ৭ (ঘ ক) উপ-ধারা। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৭ (ঘ) উপধারায় বলা হয়েছে শুধু বৈদেশিক (Oversea) নাগরিক ভারতীয় কার্ড হোল্ডারদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কথা।

সম্প্রতি লোকসভায় পেশ করা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬-র ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের তৃতীয় তফশিলের স্বদেশীকরণের যোগত্যায় 'ঘ' উপধারার সঙ্গে সন্নিবেষ্টিত করতে হবে—

'আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু জৈন, খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সী এবং শিখ ধর্মাবলম্বী লোকদের ভারতে বসবাস করার বা ভারত সরকারের কাজ করার মোট সময়সীমা '১১ বছরের কম নয়' এর স্থলে পড়তে হবে '৬ বছরের কম নয়।'

ওই ধারার সংশোধনী থেকে বলা যায় যদি কোনো ব্যক্তি গড় হিসাবে ৬ বছর বা তার অধিক সময় থেকে ভারতে বসবাস করেন বা ভারত সরকারের কাজ করে থাকেন তবে দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবেন। অবশ্য আবেদনের আগে এক নাগাড়ে ১২ মাস ভারতে থাকতে হবে এবং ওই ১২ মাস বাদ দিয়ে পূর্বের ১৪ বছরের ভিতরে গড় হিসেবে ৬ বছর বা তার অধিক সময় থেকে ভারতের বাসিন্দা হতে হবে।

তাই লোকসভায় পেশ করা নতুন বিলের সংশোধনী থেকে বলা যায় যে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খৃস্টান, বৌদ্ধ পার্সী এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা অর্থাৎ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতারিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই, এমনকী পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্টের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের নাগরিকত্ব লাভের যে নতুন প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হবে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ (Citizenship by Naturalisation)। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের উপায়ের কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় তফশিলে যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে।

ওই নাগরিকত্ব লাভের উপায় নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। প্রথমে নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে অর্থাৎ ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব রুলসের ফর্ম নম্বর ৮ (FORM VIII) পূরণ করে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ফি দিয়ে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন জানাতে হবে। জমা দেওয়ার পর একটি প্রাপ্তিরসিদও দেওয়া হবে। আবেদনকারীর দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা আছে কিনা তা দেখার ভার কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করলে ওই ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের

প্রমাণপত্র। পরে ওই ব্যক্তিকে দেশের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নিতে হবে। ওই শপথে 'ভারতের সংবিধান, আইন মেনে ভারতীয় নাগরিকত্বের সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করে চলার কথা এবং ভারতের সংবিধান ও আইনের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকিব' বলে উল্লেখ করতে হবে।

উদাহরণ সহ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করুন, 'শ্যাম' নামে এক ব্যক্তি বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে ১৯৮৫ সালের ১০ মে। বর্তমানে তার হাতে কোনো বৈধ নথিপত্র নেই এবং সে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোক (বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোক)। এছাড়াও সে আজ অবধি ভারতে বসবাস করছে। সে একজন ভাল চরিত্রের লোক। তাই 'শ্যাম' নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে অর্থাৎ ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব রুলসের ফর্ম নম্বর ৮ (FROM VIII) পূরণ করে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ফি দিয়ে দেশীয়করণের মাধ্যমে (Citizenship by Naturalisation) ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন জানাতে পারবে। যেদিন 'শ্যাম' দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের প্রমাণপত্র পাবে, সেদিন থেকেই সে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সবেমাত্র বিলটি লোকসভায় পেশ হয়েছে। কিন্তু বিলটি আইনে রূপায়িত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা বর্তমানে রাজ্যসভায় দলগত যে অবস্থা, তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের সদস্য সংখ্যা বেশি। যদিও রাজ্যসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি কিছুটা সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। জনতা পরিবারভুক্ত দলগুলি ইউপিএ-র পাশেই থাকবে বলে অনুমান। সেক্ষেত্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের এককভাবে সংখ্যার জোরে সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পাশ করানো অসম্ভব। বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৪৫। বিল পাশ করার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনর প্রয়োজন। অর্থাৎ ১৬৪ জন সাংসদ সম্মতি দিলে তবেই বিল পাশ হবে। এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সদস্য সংখ্যা মাত্র ৬৭ জন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের সদস্য সংখ্যা ৭০। জনতা পরিবারভুক্ত দলগুলির সদস্য সংখ্যা ১৬। আর এই জনতা পরিবারভুক্ত দলগুলি বিহার নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ অবধি কংগ্রেসের সঙ্গেই রয়েছে। তাই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের সদস্য সংখ্যা ৭০ এবং জনতা পরিবারভুক্ত দলগুলির সদস্য সংখ্যা ১৬ মিলিয়ে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮৬। যা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সদস্য সংখ্যা থেকে অনেকটাই বেশি। এই দলগুলি ছাড়াও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ১২। আর পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস যদি বিজেপির পাশে দাঁড়ায় তবে বিজেপি জোটের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৮২। কিন্তু বিলটি রাজ্যসভায় পাশ করাতে হলে বিজেপি জোটের দরকার পড়বে আরো ৮২ জন সদস্য। আবার তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির পাশে না দাঁড়ালে বিজেপি জোটের দরকার পড়বে আরো ৯৪ জন সদস্য। আর এই সমর্থন আসতে পারে একমাত্র জোটহীন দল থেকে।

একবার দেখে নেওয়া যাক জোটহীন দলগুলির অবস্থান। বামফ্রন্ট অর্থাৎ সিপিএম এবং সিপিআই-এর মোট সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভায় ৯ জন। এক্ষুনি বলা যায় বামফ্রন্ট এই বিলের সমর্থনে আসবে না। কারণ তাদের চিন্তা থাকবে তথাকথিত সেকুলার তকমা হারানো নিয়ে। এছাড়া বিএসপির সদস্য সংখ্যা ১০। কিন্তু সামনেই উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন আর এই নির্বাচনের কথা চিন্তা করে তারা বিজেপি জোটকে এই বিলে সমর্থন করবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। এআইডিএমকে-র ১২ জন সদস্য রাজ্যসভায় রয়েছেন। সংসদে জিএসটি বিলের জন্য বিজেপির আহ্বানে তারা কোনো সাড়া দেননি। তাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে সমর্থন জানাবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এই ৩১ জন সদস্যের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীতে সমর্থন পাওয়া বিজেপির কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ বিলের বিরুদ্ধে সদস্য সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮৬ ও ৩১ এবং দু'টি সংখ্যা মিলিয়ে মোট দাঁড়াচ্ছে ১১৭ জন। সমাজবাদী পার্টি বিলকে সমর্থন করবে কি না কোনো পূর্বানুমান করা যাচ্ছে না। তাদের সদস্য সংখ্যা ১৪। তবে এনসিপি-র ৬ জন সদস্য, ওড়িশার নবীন পট্টনায়েকের দলের সদস্য সংখ্যা রয়েছেন ৭, এরা হয়তো বা বিজেপিকে এই বিলে সমর্থন জানাতে পারেন। জে এম এম এবং টি আর এসের একজন করে সাংসদ রয়েছেন, এরাও বিজেপির পক্ষেই সমর্থন জানাবেন বলা যায়। অর্থাৎ বিজেপির পক্ষে বা বিলের পক্ষে পূর্বানুমান করে বলা যায় সমর্থন থাকবে ১০৯ জনের। তাই প্রয়োজন আরো ৫৫ জন সদস্যের। বিজেপি কীভাবে পাটিগণিত তৈরি করে সেটাই দেখার। বলাবহুল্য কংগ্রেস যদি সমর্থন জানায় তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু কংগ্রেসের অসমের নেতাদের হাভ-ভাব দেখে মনে হচ্ছে তারা সমর্থন জানাবে না। বিলকে স্বাগত জানিয়ে তারা এখনো একটি শব্দও খরচ করেনি। ভোটব্যাঙ্কের চিন্তা না করে হিন্দু বাঙালিদের প্রতি দরদ সত্যিকার অর্থে উথলে উঠত তবে হিন্দু বাঙালি-সাংসদ সুস্মিতা দেব নিজে একজন আইনের ব্যারিস্টার হয়ে এ ব্যাপারে প্রাইভেট মেম্বার বিল সংসদে উত্থাপন করেননি। ইতিমধ্যে অসম রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ জানিয়েছেন সংসদে পেশ করা নাগরিকত্ব বিলে কংগ্রেসের সম্মতি নেই। এ ব্যাপারে রাহুল গান্ধীও মুখ থেকে এখনো টুঁ শব্দ বের করেননি। তাই কংগ্রেসের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে দেখার বিষয় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ রাজ্যসভায় পাশ হয় কিনা। আর রাজ্যসভায় যদি ওই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে কোনো সংশোধন করা হয় তবে আবার পাঠাতে হবে লোকসভায় অনুমোদনের জন্য, আর তখন লোকসভায় এই সংশোধনীতে রাজি না হলে বিলকে ৩ মাস পর্যন্ত লোকসভায় আটকে রেখে দিতে পারে। ওই তিন মাসের ভিতর বিল পাশ করে নিতে হবে বা বাতিল করতে হবে নতুবা ধরে নেওয়া হবে বিলটি উভয় কক্ষে পাশ হয়ে গেছে এবং পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য। যদি বিলটি পাশ হয়, তবে সত্যিকার অর্থেই আইনটি হবে এক ঐতিহাসিক এবং মোদী সরকারের এটি একটি বলিষ্ঠ এবং সাহসী পদক্ষেপ।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থেকে দেশের সম্মাননীয় নাগরিক

সন্দীপ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই বলে থাকেন বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীরা তাঁর চোখের মণি। তাঁরা নাকি পশ্চিমবঙ্গে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করছেন। বলা বাহুল্য কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তকমা গায়ে নিয়ে আর অষ্টপ্রহর ধরা পড়ার আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটিয়ে কেউ সুখেস্বচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে না। কখনও মতুয়া সম্প্রদায় আবার কখনও মুসলমানদের মনোতুষ্টির জন্য মুখ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন এবং তারপর সুবিধামতো ভুলে যান। মতুয়াদেরই দীর্ঘদিনের দাবি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব উপেক্ষিত থেকে যায়। বামপন্থী বা কংগ্রেসিরাও এ ব্যাপারে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে নন। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম জননেতা এবং বিজেপি প্রথম ভারতীয় রাজনৈতিক দল যারা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবনা-চিন্তা করেছে এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানও বের করেছে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, জাতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র যে সংশোধনী বিল এনডিএ সরকার সংসদে পেশ করেছে সেটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন? কেনই বা মুসলমানদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ও শিখ শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হলো? বিরোধীরা এর মধ্যে রাজনীতি দেখবেন জানা কথা। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখাই তাদের দস্তুর। কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতি কোথাও নেই। ভাবগত দিক থেকে রয়েছে মানবিকতা ও ব্যবহারিক দিক থেকে দেশের নিরাপত্তাকে আরও নিশ্ছিদ্র করার বাসনা। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

প্রথমে শরণার্থীর সংজ্ঞা নিরূপণ। UNO-এর সনদ অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের (শরণার্থীদের) সংজ্ঞা— A refugee, according to UN 1951 Refugee convention, is a person who are outside their country of citizenship because they have well founded grounds for fear of persecution because of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion and is unable to obtain sanctuary. কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের অভিধান বলছে, 'A person who has esceped from his/her country for religious, political, or ecomomic reason or because of a war, is a refugee.' অক্সফোর্ডের বক্তব্যও মোটামুটি এক। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারে দেশত্যাগী ব্যক্তিকে যদি সাধারণভাবে শরণার্থী বলতে হয় তাহলে ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর, কিংবা ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যেসব মুসলমান ভারতে এসেছেন বা অবৈধ উপায়ে এখনও এসে চলেছেন তারা কোনোভাবেই শরণার্থী নন। কারণ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ (মূলত এই তিনটি দেশ থেকেই তারা এসে থাকেন) ইসলামিক দেশ। সেখানে একজন মুসলমান নিশ্চয়ই ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হবেন না। যদি অর্থনৈতিক কারণে এসে থাকেন তাহলেও বলতে হয় আফগানিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দেশ এমন কিছু পিছিয়ে পড়েনি যে সেখান থেকে চলে আসতে হবে। সুতরাং ভারত যদি মুসলমানদের দায়িত্ব না নেয় এবং শুধুমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসি, শিখ, খৃস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা ভাবে তাহলে কিছু বলার নেই। ঘটনা হলো, মুসলমান শরণার্থীরা এখন শুধু ভারতে নয় বিশ্বের বহু দেশের কাছেই বিপজ্জনক। ভারতের ক্ষেত্রে বিপদ অনেকটাই বেশি। কতটা সেটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

এই মুহূর্তে দেশে শরণার্থীর সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো নির্ভরযোগ্য তথ্য হাতের কাছে নেই। সংখ্যাটা ১ কোটিও হতে পারে আবার তার বেশিও হতে পারে। তবে ২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৩০,৮৪,৮২৬ জন শরণার্থী শুধু বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। শুধু অসমেই বাংলাদেশি শরণার্থীর (বেশিরভাগই মুসলমান) সংখ্যা ২০ লক্ষ। বেসরকারি মতে অবশ্য সংখ্যাটি ২০ মিলিয়ন (এক মিলিয়ন = ১০ লক্ষ)। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর মূলত হিন্দু বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে যে ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আসেন তারা সবাই হিন্দু নয়। তাদের একটা বড়ো অংশই মুসলমান। এরা পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে এবং বৃদ্ধির হারে হিন্দুরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ২০১৫-১৬-য় পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে দুটি রাজ্যকেই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট সারণি থেকে বৃদ্ধির ভয়াবহতা টের পাওয়া যাবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১৯৯১-র পর থেকে সন্ত্রাসবাদ ভারতে জাঁকিয়ে বসে। ২০১১-র সেন্সাস রিপোর্টেও মুসলমানদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় বৈধ প্রমাণপত্র ছাড়া মুসলমান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র যে সংশোধনী এনডিএ সরকার সংসদে পেশ করেছে। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, এই সংশোধনী প্রস্তাব

কালপর্ব	১৯৭১ থেকে ১৯৯১-এ বৃদ্ধি (%)			১৯৯১ থেকে ২০০১-এ বৃদ্ধি (%)		
গোষ্ঠী	মুসলমান	হিন্দু	পার্থক্য	মুসলমান	হিন্দু	পার্থক্য
অসম	৪১.৮৯	৩৫.৪২	৫.৫৩	১৪.৯৫	৯.৩	৪.৩৫
সারা ভারত	৯৩.২৫	২৩.০৪	৬০.৭৯	৭০	১৯.৩	৫.৩
কালপর্ব	১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এ বৃদ্ধি (%)			১৯৯১ থেকে ২০০১-এ বৃদ্ধি (%)		
গোষ্ঠী	মুসলমান	হিন্দু	পার্থক্য	মুসলমান	হিন্দু	পার্থক্য
পশ্চিমবঙ্গ	৬১.০৫	১৩.৬৭	৪৫.৬২	৬৪.২৬	১৬.১	৫১.৮৪
সারা ভারত	৫২.০৮	২২.০৯	৩০.০১	৫০	২০.৩	২৯.৩

কার্যকর হবার পর কোনো হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খৃস্টান শরণার্থীকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না। কোনোরকম বৈধ প্রমাণ ছাড়াই তারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার আগে তাদের অন্তত ৬ বছর (আগে ছিল ১১ বছর) ভারতে বসবাস করতে হবে অথবা সরকারি কাজকর্মে যুক্ত থাকতে হবে। স্বদেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে হলে অন্তত ৭ বছর (আগে ছিল ১২ বছর) ভারতে থাকা জরুরি। এই সংশোধনীতে মুসলমানদের কথা বলা হয়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে তাদের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রদানের ভিত্তি হবে অসম চুক্তি। অর্থাৎ ১৯৭১-র পর যে সব বাংলাদেশি মুসলমান ভারতে এসেছে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। অন্যরা শর্তসাপেক্ষে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে।

২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত বিতাড়িত আফগানিস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই প্রতিশ্রুতিটি যথেষ্ট মানবিক। ভারত ছাড়া অন্যদেশের ছিন্নমূল হিন্দুরা যাবেনই বা কোথায়! কিন্তু মানবিকতার পাশাপাশি আরও একটি কারণে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর সরকারের আইন সংশোধনের প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানরা যেভাবে সুকৌশলে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে তাতে কয়েকদশক পর শুধু জেলা নয় রাজ্যগুলিও মুসলমান- প্রধান হয়ে যাবে। আইসিস আলকায়দার মতো সন্ত্রাসবাদীরা বহুদিন ধরেই ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। তাদের প্রথম লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ মিলিয়ে অখণ্ড ইসলামিক বাংলা খিলাফত গঠন। মুসলমান জনসংখ্যা এইভাবে বাড়তে থাকলে যা হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই বিপদ থেকে বাঁচার অন্যতম প্রধান উপায় হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। কিন্তু এত দ্রুত হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সেই দিক থেকে দেখলে প্রবাসী হিন্দুদের দেশে ফিরিয়ে এনে হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কুশলী এবং কৌশলী পদক্ষেপ। তবে এর সঙ্গে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করাও জরুরি। মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার প্রায় খেয়ালখুশি মতো বিবাহবিচ্ছেদ এবং একাধিক বিবাহের ধর্মীয় অনুমোদন। মুসলমান মহিলারা তিন-তালাক প্রথা নিয়ে ইতিমধ্যেই বীতশ্রদ্ধ। নরেন্দ্র মোদী সরকার যদি সাহায্য করে তাহলে মুসলিম পারসোনাল ল এবং ওয়াকফের মতো সামন্তপ্রভু মার্কা আইন এ দেশ থেকে বিলুপ্ত হতে পারে। তার থেকেও বড়ো কথা মুসলমানদের যে অংশ ভারতের ক্ষতি করতে বদ্ধপরিকর তাদের থামানো যেতে পারে।

যাইহোক, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হলে সেটি হবে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কয়েক লক্ষ হিন্দু স্রেফ প্রমাণপত্রের অভাবে নিজের দেশে (ভারত সব হিন্দুর কাছেই নিজের দেশ) অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তকমা গায়ে মেখে বাস করছেন। এই আইন পাশ হলে তারা পায়ের নীচে মাটি পাবেন। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থেকে হয়ে উঠবেন দেশের সম্মাননীয় নাগরিক। সরকারি শংসাপত্র পাওয়ার পর তারা জমিবাড়ি কিনতে পারবেন। প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খোলা যাবে। সব মিলিয়ে অ-মুসলমান শরণার্থীদের জন্য সত্যিই ভালো খবর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিলটি আদৌ পাশ হবে তো? রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তি কম। কংগ্রেস সিপিএম-সহ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শিবিরের হাল অনেকটা তৈলাক্ত বাঁশে চড়া বাঁদরের মতো। যতটা ওঠে ততটাই নেমে যায়। সুতরাং কে সমর্থন করবে আর কে করবে না বলা মুশকিল। বিজেপি যদি নিখুঁত অঙ্ক কষে বিলটি পাশ করিয়ে আনতে পারে তাহলে সেটি হবে হিন্দুদের পক্ষে অতীব শ্লাঘার বিষয়। কারণ তারপর কোনোদিন কোনো হিন্দুকে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বিদেশের মাটিতে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে না। আবার দেশে ফিরে এসে চোরের মতো মুখ লুকিয়েও থাকতে হবে না।

চিঠিপত্র

বাংলাদেশে পুরোহিত হত্যার প্রতিবাদ

সম্প্রতি বাংলাদেশের পাবনা সৎসঙ্ঘের পুরোহিত হত্যা এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে হত্যার হুমকি দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংস্থা তার প্রতিবাদে মিটিং মিছিল করে তার প্রতিবাদ করেছে। সৎসঙ্ঘের প্রধান পরম পূজনীয় ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকুল চন্দ্র ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমান দেশ পূর্ব পাকিস্তানে তো থাকা যাবেই না, এমনকী পশ্চিমবঙ্গও অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের কবলে চলে যাবে। তাই দেশভাগের পর কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পাবনা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে বিহারের দেওঘরে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিষ্যসংখ্যা প্রায় কোটির কাছাকাছি। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে, সৎসঙ্ঘের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়নি। তিনি রসুলগীতা নামক পুস্তকে ইসলামের গুণকীর্তন করেও ইসলামি মৌলবাদীদের হাত থেকে নিজের শিষ্যকে রক্ষা করতে পারেননি।

দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ মিশনের কথাই ধরা যাক— ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম মতে সাধনা করে 'যত মত তত পথ' আবিষ্কার করেছেন। ইসলাম সাধনার পর তাঁরা গোমাংস খেতে ইচ্ছা করেছিল এবং দক্ষিণেশ্বরে মা-য়ের মূর্তি দর্শনেও অনীহা হয়েছিল। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের যে নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে তার গম্বুজের উপর ইসলামের প্রতীক চাঁদ তারা অঙ্কিত করেও মৌলবাদী মুসলমানদের হুমকির হাত থেকে রক্ষা পায়নি এবং মহারাজ প্রাণভয়ে ঢাকা ত্যাগ করে বেলুড় মঠে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, সে রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য সংখ্যাও প্রায় এক কোটির কাছাকাছি, তারাও এই ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ সভা বা বিবৃতি দেননি। তাই আমার বোধগম্য হলো না যারা আক্রান্ত তারা যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত, তখন অন্য সংস্থাগুলির এ নিয়ে মাতামাতি করার কী প্রয়োজন, তাদেরও চুপচাপ থাকা যুক্তিযুক্ত নয় কী?

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

সাধারণ বর্ণমালা

১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় ঐক্যের ঘোষণা আছে। জাতীয় ঐক্যের জন্য সাধারণ ভাষা একটি অনুঘটক হতে পারে। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশি ভাষা ইংরেজিই ছিল সরকারি ভাষা। সাহেবরা এটি করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে বলবৎ রেখেও আরও একটি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুভূত হলো। তাই ইংরাজির পাশাপাশি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে অন্য ভারতীয় ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হলো। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ অংশের অধিবাসীদের কাছে হিন্দি বোধগম্য হলেও ভারতের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব অংশের ভাষা সব ভারতবাসীর কাছে বোধগম্য নয় এবং দক্ষিণ- ভারতেও প্রবল হিন্দি-বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। ভাষা-বিরোধ ভারতের একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এই ভাষা-বিরোধ থেকে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়ে জাতীয় একতার সামনে সমস্যাটি একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সবাই ভুলে গেলেন যে সব ভারতীয় ভাষার জননী হলো সংস্কৃত ভাষা; এই সমস্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে একাধিক সংস্কৃত শব্দ আছে। একটু অনুধাবন করলেই এটা আমরা বুঝতে পারব। আর যদি সারা ভারতের সব ভাষার একই বর্ণমালা হয় এবং সকলেই সেটা পড়তে পারেন তবে একে অপরের অর্থাৎ এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষাও অনেকটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু কী হতে পারে সেই সাধারণ বর্ণমালা? আমার প্রস্তাব হলো, সেই সাধারণ বর্ণমালা হোক দেবনাগরী। এই দেবনাগরী অক্ষরগুলির সঙ্গে অন্য ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালার সাদৃশ্যও আছে। এই ব্যাপারটি যখন সমস্ত ভারতবাসী উপলব্ধি করতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় কিছু না কিছু সংস্কৃত শব্দ থাকার জন্য সব ভাষার মধ্যে একটা মিল রয়েছে তখন কেউ আপত্তি করতে পারবেন না। এর দ্বারা জাতীয় সংহতি ও স্বাভিমানবোধ সৃষ্টি হতে পারে।

আমাদের দেশের কর্ণধারগণ জাতীয় সংহতির মূল সূত্রটি কোথায় তা ধরতে অসমর্থ হয়েছেন। যদি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি-সহ ব্যবহারযোগ্য করা হোত তাহলে হয়তো দক্ষিণ ভারত-সহ কোথাও ভাষা নিয়ে কোনো ঝগড়াঝাঁটি হোত না। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন সরকার স্বীকৃত সব ভারতীয় ভাষার জন্য দেবনাগরী বর্ণমালা ব্যবহৃত হোক (মূল আঞ্চলিক বর্ণমালাকে অব্যাহত রেখেই)। এর দ্বারা ইংরেজির গোলামি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। সব স্বাভিমানসম্পন্ন জাতিই এটা করে থাকে।

—**শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী,**
গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

ভারতের পক্ষে এম এন রায়-মেক্সিকো সম্পর্কের স্মরণ বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল

দেবী প্রসাদ রায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মেক্সিকো সফরের সাফল্য ভবিষ্যতের জন্য আরো অর্থবহ হোত যদি এম. এন. রায়ের সঙ্গে মেক্সিকো সম্পর্কের উল্লেখ থাকত। এম. এন. রায় যাকে দ্বিতীয় জন্মভূমি জ্ঞান করেছেন, উল্লেখ করেছেন, সেই মেক্সিকোই তাঁকে লেনিনের আমন্ত্রণে কমিনটার্নে যোগ দিতে মস্কো যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করেছিল। রাশিয়ায় এম. এন. রায় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন ইতিহাস তৈরি করেছিলেন যার প্রভাব ছিল বিশ্বব্যাপী।

সুদূর অতীতে মেক্সিকো-সহ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি ভারতীয় সভ্যতার স্পর্শে সঞ্জীবিত ছিল। মেক্সিকো, পেরু, গুয়াতেমালা ইত্যাদি দেশে ভারতীয় জীবনচর্যার প্রভাব অস্পষ্টভাবে আজও বিদ্যমান। দেওয়ান চমন লালের 'Those Hindus of America-তে তার বহু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। ওই দেশের মানুষরা মনে করত প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ভারতীয় সভ্যতা এখানে পৌঁছেছিল, ভারত-দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগও ছিল। দক্ষিণ গোলার্ধের এইসব অঞ্চলকেই ভারতীয় 'পদ্মপুরাণে' 'পাতাল' বলা হোত। এর ছিল সাতটি ভাগ— অতল, বিতল, মহাতল, সুতল তলাতল, রসাতল ও পাতাল। এই 'মহাতল'ই ছিল 'মহাক্ষ্যা' বা মেক্সিকো। মেক্সিকোর রানি যাকে বলত মেহ-হিকে। মেক্সিকোতে ছিল জরুৎকারু মুনির পুত্র আস্তিকের বংশধররা যাদের সভ্যতা অভিহিত হয়েছে আস্তিক বা অ্যাজটেক সভ্যতা নামে। এম এন রায় যখন আমেরিকায় পুলিশের তৎপরতায় উদ্বিগ্ন তখন মেক্সিকোর সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা তাঁর থাকার পক্ষে অনুকূল মনে করে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত এক চিঠি সম্বল করে 'য়ুকাতান' প্রদেশ গিয়েছিলেন যা কিনা মেক্সিকোতে 'মায়া' সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। এম এন রায় সস্ত্রীক (স্ত্রী এভলিন ট্রেন্ট) মেক্সিকোর ওই য়ুকাতান প্রদেশের উদ্দেশে মেক্সিকো আসেন। য়ুকাতান প্রদেশের গভর্নর এস ভারাডোরের সঙ্গে দেখা করেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র সংগ্রহে বিদেশে আসা এই বিপ্লবী এম এন রায় ও তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার 'ইন্দো-জার্মান— ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ সম্বন্ধে এস ভারাডো অবহিত ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর প্রয়াসে শেষ অবধি মেক্সিকোর সরকার প্রধান জেনারেল ভেনিওসিয়ান কারাঞ্জা (Carranza)-র সঙ্গে এম এন রায় দেখা করতে সমর্থ হন। কারাঞ্জা সমস্তরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি-সহ রায়ের থাকার ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সমূহের ব্যবস্থা করেন। স্প্যানিশ ভাষা আয়ত্ত করে বেসরকারি মুখপত্র 'এল পুয়েব লো'র সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলি মেক্সিকোর বিদ্বৎমহলে সাড়া জাগালো। EI Herald নামে এক পত্রিকাও তিনি শুরু করলেন। 'মনকো ডকট্রিন'-এর বিরুদ্ধে তাঁর মতামত এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির জন্য এক সার্থক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দাবি তাঁকে অসম্ভব জনপ্রিয় করে তুললো। প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার সহযোগিতার নতুন করে ভারতে অস্ত্র পাঠানোর প্রয়াস নানা ধরনের প্রতিকূলতায় ব্যর্থ হলো। পানামা অবধি গিয়ে এক বিপদসঙ্কুল পথে তাঁকে ফিরতে হলো। মেক্সিকোর প্রয়োজনে তাঁর প্রত্যাবর্তনে প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা খুশিই হয়েছিলেন। শ্রীরায় আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকোর ক্রমবর্ধমান তিক্ততার প্রেক্ষিতে মেক্সিকোতে জনসমর্থন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য তাঁর উদ্যোগ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হলো। 'La Mujer Moderna' পত্রিকার সম্পাদিকা আয়োজিত এক সভায় রায়ের পরিকল্পনা পুস্তক সমর্থিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের মন জয় করলেন। তাঁর পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা অনুমোদন করলেন। এরপরই রায়ের উদ্যোগে মেক্সিকো শহরে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে 'সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ মেক্সিকান রিজিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হলো। রায়ের নেতৃত্বে সকলেই নির্দ্বিধায় As Companaro India (The Indian Comrade)-কে স্বাগত জানালো। লেনিনের পাঠানো মাইকেল বোরোদিনকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে বহির্বিশ্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় পা রাখার ব্যবস্থা করলেন এম এন রায়। চমৎকৃত লেনিন Second Communist International-এ যোগ দিতে এম এন রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন। এক বৃহত্তর ভূমিকায় রায়কে দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ১৯১৯ সালের নভেম্বরে পূর্ণ সমর্থন-সহ এম এন রায় ও এভলিন ট্রেন্টের রাশিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন— মেক্সিকান কূটনৈতিক পাশপোর্টে মেক্সিকান নাম 'সিনর ও সিনরা রবার্টো এ্যালোনি ভিলা গার্সিয়া' ঠিক করা হলো রাশিয়া যাত্রার জন্য।

এই এম এন রায়ের উল্লেখ মোদীর সফরকালে খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল। সেটা হয়নি, যেমনটা হয়নি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ব্রাজিল সফরের সময়। ব্রাজিলের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ সহায় আর এক বাঙালি কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম একবারও স্মরণ করেননি। ব্রাজিলবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত এই বাঙালির নামোল্লেখে ভারতেরই লাভ হোত।

ব্যাপারগুলি পরবর্তীকালে মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ কূটনৈতিক তৎপরতার এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভারতের সভ্যতার স্পর্শ পাওয়া দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলার সুযোগ ভারতকে নিতে হবে। *(লেখক অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, বাঁকুড়া)*

মাদুরাইয়ের কাছে উদ্ধার প্রাচীন নগরী

চিন্ময় ভট্টাচার্য

মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে আস্ত একটা সভ্যতা। সময়ের সারণিকে পিছনে ঠেলে ঢুকে পড়েছে গবেষণার গর্ভগৃহে। ইতিউতি খোঁড়া মাটি, তার বুক চিরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। এই সব বুকে ধরে রেখে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছে কিলাদি। তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের এই অখ্যাত গ্রাম আজ ঐতিহাসিকদের চোখের মণি।

মাদুরাই থেকে কিলাদির দূরত্ব মেরেকেটে ১২ কিলোমিটার। জায়গাটা শিবগঙ্গা জেলার মধ্যে পড়ে। মহেঞ্জদড়োর মতোই এখানেও প্রাচীন নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জদড়োর সমান আয়তনের স্নানাগার মিলেছে কিলাদিতে। গবেষকরা মনে করছেন, এই সভ্যতা সঙ্গম যুগের। আজ থেকে ২ হাজার ৩০০ বছর আগেকার। এখনও পর্যন্ত কিলাদি গ্রাম থেকে ৩ হাজার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে চোল রাজা রাজরাজের সময়ের মুদ্রাও। ইতিহাস অনুযায়ী চোল সম্রাট সুন্দর চোলের ছেলে রাজরাজের রাজত্বকাল (৯৮৫-১০১৪ খৃস্টাব্দ)। সঙ্গম যুগের ভগ্নাবশেষের জমিতে রাজরাজের সময়কার মুদ্রা প্রমাণ করেছে। পরবর্তী যুগে ওই অঞ্চলে চোলেদের আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। এমনই ধারণা ঐতিহাসিকদের। তাঁরা মনে করছেন পরবর্তী যুগে কিলাদি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদুরাই। তৎকালীন বন্দর শহর আলাগানকুলামের মধ্যে কিলাদি ছিল বড় জনপদ।

কিলাদিতে চলছে খননকাজ।

তবে, সেসব অনেক পরের সময়ের কথা। সঙ্গম যুগের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার এবং তার ছেলে অশোকের সময়ের। সেই হিসেবে সঙ্গম যুগ দ্রাবিড় সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রকাশ। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যে এই যুগের কথা রয়েছে। তবে, এতদিন তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সেই অর্থে ছিল না।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্তা কে অমরনাথ রামকৃষ্ণন জানিয়েছেন, '১৯৬৫ থেকে তামিলনাড়ুতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধারের জন্য ব্যাপক আকারে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। কিলাদিতেই খোঁড়াখুঁড়ি চলছে ২০১৩ থেকে।' পুরাতত্ত্ববিদ এম রাজেশ জানিয়েছেন, 'নদীমাতৃক ভারতে নদীভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদীর তীরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার নাম সিন্ধু সভ্যতা। তেমনি, সঙ্গম যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভাইগাই নদীর তীরে। সেই কারণে আমরা এই সভ্যতার নাম দিয়েছি ভাইগাই নদী উপত্যকা সভ্যতা। মহেঞ্জদড়োতে ২০ বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছিল। আমরা এখানে ৮০ একর এলাকায় খনন চালাব।' কিলাদির বাসিন্দার সংখ্যা পাঁচ হাজার। স্থানীয় লোকজন বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এত প্রাচীন সভ্যতা তাঁদের জমির নীচে লুকিয়ে ছিল। খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে তাঁরা প্রতিদিন ভিড় করছেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা আবার বলছেন, 'ভাগ্যিস এখানে ব্যাপক আকারে জনবসতি গড়ে ওঠেনি! গড়ে উঠলো সঙ্গম যুগের এই নিদর্শন চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত।'

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১০ জনের দল কিলাদিতে তাঁবু টাঙিয়ে থাকছেন। কাজ চলছে মেপেজোকে। খোঁড়াখুঁড়ির জন্য মেশিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। মেশিনের ব্যবহারে নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই কারণে খননের কাজ চলছে আপন গতিতে, নিজস্ব কায়দায়। প্রয়োজন বুঝে এককে দিন ১০ সেন্টিমিটারের বেশি কাটা হচ্ছে না। খোঁড়াখুঁড়ির সময় বহু দুর্মূল্য রত্ন পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ১৩ চাকের কুঁয়ো। এই সব চাক টেরাকোটার। সেই সময়ে কুমোর চাক তৈরির কৌশলও মানুষ জানত দেখে গবেষকরা অবাক। বিভিন্ন পাত্রে আবার তামিল ব্রাহ্মী হরফের লেখা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এই তামিল ব্রাহ্মী হরফ থেকেই বর্তমান তামিল হরফের সৃষ্টি। পুরাতত্ত্ববিদ সি সান্মানালিঙ্গম জানিয়েছেন, 'সম্ভবত সঙ্গম যুগেই লিখিত শব্দের শুরু হয়েছিল।' কথায় আছে, ইতিহাস নাকি কথা বলে। সেই কথা মানলে বলতে হয়, কিলাদি থেকে সঙ্গম যুগও আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল।

মানবজাতির প্রথম আইন প্রণেতা

মনু

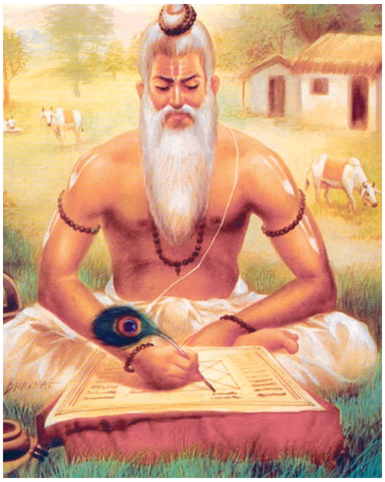

অমিত ঘোষ দস্তিদার

পরম্পরাগতভাবে ভারত আজও স্মৃতিময়। বিশ্বে ভারত তাই শ্রুতির বিস্ময়। বিশ্ব আজও বিস্ফারিত চোখে তাকায় সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতিময় এই ভারতভূমির দিকে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতের বিকশিত বিস্ময়কে স্তিমিত করতে চায় নানা অশুভ শক্তি। ভারতীয় সৃষ্টিশীলরূপকে খৃষ্টরা নানাভাবে মুছে দিয়ে খৃস্টের অনুসারী করার নানা অছিলায় থেকেও ব্যর্থ। মধ্যপ্রাচ্যশক্তি গায়ের জোরে ধ্বংস করেছে আমাদের নানা ঐতিহ্য। ঔপনিবেশিকতাবাদও পদদলিত করেছে আমাদের। কিন্তু কেউই কোনোভাবেই পেরে ওঠেনি। দেশজ শত্রুরাও লোভের বশবর্তী হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রলোভনের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে দেশজ ঐতিহ্য নিয়ে সমালোচনায় ব্যস্ত আজও। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ভারতীয় ঐতিহ্যগত সৃষ্টিশীল ধ্বজা সুউচ্চে তুলে ধরা। কালের হিসাব দিয়ে ভারতীয় পরম্পরাগত স্মৃতিকে হিসাব করা যায় না। কারণ এর ব্যাপ্তির কোনো কিনারা নেই। তাই এই ভূমির জাতীয় চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারাকে কেউই স্পর্শ করতে পারে না। সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক সভ্যতার থেকে পূর্ববর্তী না পরবর্তী সে বিষয়ে বিতর্ক চলতেই পারে, তাতে আমাদের সংস্কৃতির কিছুই এসে যায় না, বরং দিনে দিনে আমাদের সংস্কৃতি বিশ্ব সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করে চলেছে এবং অবশ্যই করে যাবে।

মনু ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং প্রতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব। সুপ্রাচীনকাল থেকে মনু মানবজাতির পিতারূপে স্বীকৃত। তিনি আদিত্য বিবস্বতের পুত্র বলে বিবস্বান। আবার স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বায়ম্ভুবমনু রূপে পরিচিত। যেহেতু মনু মানবজাতির পিতারূপে পরিগণিত, সেই কারণে তিনি আবার নৈতিক-সামাজিক আদর্শের প্রবর্তক, শাসক, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যজ্ঞানুষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তা, আইন প্রণেতা ব্যক্তিরূপেও স্বীকৃত। যাস্ক, তৈত্তিরীয়, মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মেধাতিথি এবং গোবিন্দরাজ প্রমুখ মনুকে এমন এক মহর্ষি বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ এবং পৃথিবীর উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় বিষয়ে এক মহাজ্ঞানী।

নারদস্মৃতি আমাদের জানাচ্ছে--- মনু প্রথমে যে ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছিলেন তা ছিল এক লক্ষ শ্লোক সংবলিত। যা ১০৮০টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। দেবর্ষি নারদ তাকে বারো হাজার শ্লোকে, মার্কণ্ডেয় ঋষি আট হাজার শ্লোকে, ভৃগুর পুত্র সুমিত চার হাজার শ্লোকে, এইভাবে সংস্কৃত হতে হতে বর্তমান মনুসংহিতা বারোটি অধ্যায়ে মোট ২৬৯৪টি শ্লোকে শোভিত হয়ে আছে। মনুসংহিতা ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, নানা প্রকার ব্যবহারবিধি, বিবাহ, ব্রত, উপাসনা, অভিবাদন, স্নান, মহাযজ্ঞবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, জীবিকা বিষয়, খাদ্যাখাদ্য, অশৌচ, সর্ববিষয়ে শুদ্ধি, রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পুরুষধর্ম, ঋণদান, বিচার, সাক্ষের নিয়ম, সাক্ষীকে প্রশ্ন করার নিয়ম, স্ত্রী এবং পুরুষের পারস্পরিক ধর্ম, খেলা, ব্যবসা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় মনু তাঁর শাস্ত্রে উল্লেখ করে গেছেন। বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের জীবনের জীবনধারণে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে যে বিষয়ের দ্বার স্পর্শ করতে হয়, সেই সবকিছুই মনু ব্যক্ত করে গেছেন। এত বিরাট জ্ঞান পরিধি আজও বিশ্বে বিরল। মনুর বক্তব্যের সঙ্গে কৌটিল্য এবং ব্যাসদেবও একমত। মনু রাষ্ট্রের সাতটি বৈশিষ্ট দেখিয়েছেন— স্বামী অর্থাৎ রাজা, অমাত্য অর্থাৎ মন্ত্রী, জনপদ অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং প্রজা, দুর্গ— সংরক্ষিত নগর বা রাজধানী, কোশ--- অর্থভাণ্ডার বা অর্থ সঞ্চয়, দণ্ড— রাষ্ট্রশাসনের উপায় ও শক্তি, মিত্র--- নিজের অনুকূল পররাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই সাতটি অঙ্গকে আরও সহজবোধ্য করার জন্য মনু কী সুন্দরভাবে মানুষের দেহের অঙ্গের উদাহরণে ব্যক্ত করেছেন। কারণ প্রতিনিয়ত সেই উদাহরণ মানুষের সঙ্গেই থাকবে এবং কাজের সুবিধা হবে। মাথা হলেন রাজা, মন্ত্রীরা হলেন চোখ, রাজার মিত্রগণকে কানের সঙ্গে তুলনা করেছেন, রাজকোষ হলো— মুখ, দণ্ড বা বল হলো— মন, দুর্গ হলো হাত, জনপদ হলো পা।

মনু এবং মনুসংহিতার সময়কাল নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের বক্তব্য অনুসারে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র নির্মাণ করে প্রথমে তাঁর শিষ্য মনুকে শিখিয়েছিলেন। তারপর মহর্ষি মনু তা মরীচি প্রমুখ ঋষিকে শিখিয়েছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত আছে যে মনু-শিষ্য ভৃগু এই মানবস্মৃতি-শাস্ত্র ঋষিদের শোনাবেন। 'স্মৃ' ধাতু হলো স্মরণ করা বা মনে করা। যাকে স্মরণ করা হয় তা হলো 'স্মৃতি'। আগে ঘটে গেছে এমন অবস্থাকে মনে রাখা। পরম্পরাগতভাবে শুনে শুনে মনে রাখা হলো— 'শ্রুতি'। সেই পরম্পরাগতভাবে আমরা আজও যা মনের মধ্যে রাখছি তা হলো শ্রদ্ধা।

ধর্মশাস্ত্রের অপর নাম--- স্মৃতি। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২-১০) একথা স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে যে ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতি— ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ। কুল্লভট্ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার জানিয়েছেন— 'মন্বাদিশাস্ত্রং স্মৃতিঃ' মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতিপদবাচ্য। মনিয়র উইলিয়ামস্ এবং জন ডাউসন্ দু'জনেই বলেন যে, যা আচার্যদের দ্বারা স্মৃত এবং অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক্রমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাই-ই স্মৃতিপদবাচ্য—'What has been remembered and handed down by tradition' (John Dowson– A classical dictionary of Hindu Mythology, Page-301)।

পরম্পরা

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারক রূপে রবীন্দ্রনাথ

রবীন সেনগুপ্ত

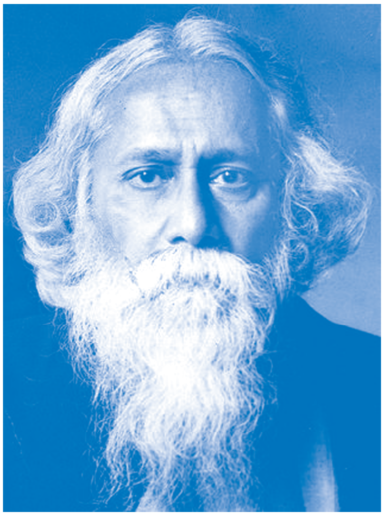

রবীন্দ্রনাথের কর্মে ও লেখনীতে নানা দিক রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথ, বাউল রবীন্দ্রনাথ, প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ, বক্তা রবীন্দ্রনাথ এই রকম আরো কিছু। কবি, গায়ক, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তো বহুল আলোচিত। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত আধ্যাত্মিকতার অগ্রগণ্য প্রচারক রবীন্দ্রনাথকে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই চেনেন। শুনেছেন অনেকেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবচন বাক্য অধিক চর্চিত নয়, কারণ তা যথেষ্ট শক্ত বিষয়।

যেমন একটি পুরাতন কথা প্রবন্ধে কবিগুরু বলছেন— ''ধর্মের শক্তি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত। সেই জন্য তাহাকে হাজারো বার আঘাত করিয়াও পরাস্ত করিয়া মুছিয়া ফেলা যায় না।''

ভারতবর্ষ প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখছেন— 'আধ্যাত্মিক একাকিত্বের ভাবধারা যাহাদের মধ্যে নেই তাহাদের পক্ষে ভারতবর্ষের মহিমা বুঝিতে পারা সম্ভবপর নহে।' একই প্রবন্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় অপর একটি মন্তব্য হলো— ''সনাতন ভারতবর্ষের কেউই ক্ষতি করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষের জয় হইবেই। আমরা যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি— তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎ উদার প্রাচীন ভারতবর্ষের যে চিরায়ত ঐতিহ্য তাহারই জয় সুনিশ্চিত।''

গীতা ও অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্রে নিষ্কাম হৃদয়ে ঈশ্বর উপাসনার যে উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাকার নিরাকার প্রবন্ধে আমরা তারই সপক্ষে সুন্দর একটি উক্তি পাই। সেই বাক্যগুলিতে তিনি বলছেন— ''ঈশরকে সকলে চায় না। পারমার্থিক দিকে সকলের মন থাকে না। ধন, ঐশ্বর্য, সুখ, সৌভাগ্য, পুণ্য অর্জন, পাপক্ষয়— ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেবদেবীর সেবা ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্ম করাকে আধ্যাত্মিক বৈষয়িকতা বলে। উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতায় এই ধরনের চাওয়া পাওয়ার সম্পর্ক থাকে না।''

বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— এরকম অনেক সাহিত্যিক মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতাকে অপ্রয়োজনীয় বলেছেন। কিন্তু 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ মিষ্টি কথার চাবুকে এই অর্বাচীন চিন্তাবিদগুলিকে কী চমৎকার শাসন করেছেন। কবিগুরু এই প্রসঙ্গে বলছেন— 'জীবনকে একরূপ চালাইয়া রাখিতে চাহিলে ধর্ম ও ঈশ্বর ব্যতীতই চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মহৎ ভাবধারা ও বৃহৎ উদ্দেশ্যে চলিতে গেলে অনন্ত ক্ষমতাশালী ধর্মশক্তি ও ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন হইবেই।'

গীতাশাস্ত্রের উপর রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সদর্থক মন্তব্য আছে। তার মধ্যে এক স্থানে তিনি বলছেন— 'গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখা যায় তাহা একান্তই ভারতবর্ষের। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে গীতার বাণী শুনিবার মতো ধৈর্যবান শ্রোতা কেবল ভারতেই থাকা সম্ভব।'

সীতাদেবী সম্পর্কে এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'সেই সীতাই পরম মঙ্গলময়ী, কল্যাণকর। সীতাকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে সভ্যতার মঙ্গলময় দিককেই যেন উদ্ধার করা হইয়াছে।' বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'বৈষ্ণবরাই সাহিত্যের মাধ্যমে মানব সমাজে শাস্ত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন প্রথম শুরু করেন। সাহিত্যকে রাজদ্বারের বাইরে সাধারণের মধ্যে বিস্তার করার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বৈষ্ণবদের যে শক্তি তাহা প্রেমের শক্তি, হ্লাদিনী শক্তি। শৈব শাক্ত সম্প্রদায়ের রয়েছে বলরূপিণী শক্তি।'

সাকার ও নিরাকার সম্পর্কে একস্থানে কবি বলেছেন— 'কোনো স্বভাব-ভক্ত যখন মূর্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন আপন প্রতিভাবলে মূর্তিকে অমূর্ত করিয়া দেখিতে পারেন। সেই অসামান্য প্রতিভা চৈতন্য মহাপ্রভুর ছিল, রামপ্রসাদের ছিল। সাধারণ মানুষের এই জাতীয় বোধ অতটা থাকে না।'

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য দিক— একাকিত্ব, আধ্যাত্মিকতা, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, চৈতন্যদেব, রামপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মূল্যবান মন্তব্য করে আমাদের এই সব বিষয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। বাংলা মুলুকে তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট, কিন্তু তাঁর এই সব শিক্ষার বেশি প্রচার নেই। তাই বাংলা আজ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিরোধী, বৈষ্ণব সাত্ত্বিকতা বিরোধী। বেদ, গীতা না পড়া নর-নারীতে পরিপূর্ণ। যার জন্য জাতীয়তাবোধ পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

পাখির রাজা গরুড়

জীবজগতে সবারই রাজা আছে। যার বেশি শক্তি, বেশি বুদ্ধি সেই সবসময় রাজা হয়। পশুদের রাজা যেমন সিংহ। কারণ পশুদের মধ্যে সিংহ সবচেয়ে শক্তিশালী। তেমনি পাখিদের রাজা হলো গরুড়। বিশাল আকারের এক পাখি। তাঁর বড় বড় দুটি পাখা, গায়ে ভীষণ জোর। দুই পাখা মেলে যখন সে ওড়ে তখন হুলস্থুল পরে যায় গোটা এলাকায়। ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়। এ আসলে বড় ঈগল পাখি। ইন্দোনেশিয়া গেলে সেখানে দেখা যাবে কেবল বিশাল আকারের এক গরুড়ের মূর্তি। ওই দেশের বিমান সংস্থার নামও গরুড়। এছাড়া ওদেশের টাকাতে গরুড়ের ছবি আছে।

অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত পৌরাণিক গরুড়ের। পুরাকালে কশ্যপ নামে এক ঋষি ছিলেন। সেই ঋষি পুত্র কামনায় এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন। গুণী জ্ঞানী মুনিঋষিরা সেই যজ্ঞে এলেন। তাঁরা যজ্ঞে সংকল্প করলেন যে, কশ্যপের এমন এক পুত্র জন্মাবে যে কিনা ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে রাজা হবে। এই কথা কানে যেতেই ইন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা। দেবতারাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এখন কী হবে?

ইন্দ্র তখন কশ্যপের কাছে এসে বললেন— এ আপনারা কী করছেন? আপনারাই আমাকে রাজা করেছেন, এখন আপনারাই আমাকে বিনাশ করতে চাইছেন? কশ্যপ বুঝলেন এ তো মহাবিপদ। রাজার সম্মানহানি হয়। কিন্তু এদিকে তো কিছু করার নেই। যজ্ঞে সংকল্প করা হয়েছে মানে সেটা কখনো মিথ্যে হবে না। তখন কশ্যপ ও অন্য মুনিরা বললেন— ঠিক আছে, যে সন্তান জন্মাবে সে হবে পক্ষীকুলের রাজা। মুনিদের এই কথা শুনে ইন্দ্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর যথারীতি কশ্যপের বিনতা নামে এক পত্নীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মাল তাঁর নাম হলো গরুড়।

বিশাল আকারের শরীর ও ভয়ানক বলশালী হলো এই গরুড়। এক নিমেষে সে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে উড়ে যেতে পারে। একটা প্রকাণ্ড হাতিকে একাই খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু গরুড়ের প্রিয় খাবার হলো সাপ। সাপ পেলেই সে ঝটপট খেয়ে নেয়।

একবার হলো কী কিছুতেই গরুড়ের খিদে মেটে না। সে বাবাকে গিয়ে বলল— বাবা তুমি আমাকে এমন কোনো খাবার দাও যা খেলে আমার খিদে মিটবে।

বাবা কশ্যপ তখন তাকে একটি দুষ্ট হাতি ও একটি দুষ্ট কচ্ছপ দেখিয়ে দিলেন। সেই কচ্ছপ আর হাতি সবসময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। গরুড় গিয়ে তাদের মেরে ফেলল। মারা সহজেই হলো কিন্তু খাবে কোথায়? একে তো তার অতবড় শরীর, তারপর সে হাতি আর কচ্ছপের ওজন। কোনো গাছ ধরে রাখতে পারবে না। গরুড় উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। কোথাও এমন বড় গাছ পায় না যে তাঁর ওজন ধরে রাখতে পারবে। অবশেষে এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে সে নামলো এবং মনের আনন্দে পেট ভরে খেল।

ভারতের পথে পথে

নালন্দা

ভারতের একটি প্রাচীন উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি পরিচিত ছিল নালন্দা মহাবিহার নামে। নালন্দার অবস্থান বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। খৃস্টিয় ৪২৭ অব্দ থেকে ১১৯৭ অব্দ পর্যন্ত এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই মহাবিহার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। চীন, গ্রীস, পারস্য ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে পড়াশুনা করতে আসতেন। লাল ইটের তৈরি এই বিহারের আয়তন ছিল ৩০ একর। তৎকালীন হিন্দু রাজারা এটি নির্মাণ করেন। ১১৯৩ সালে মুসলমান আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি নালন্দা আক্রমণ করে এবং লুঠ করে। প্রাচীন গ্রন্থ, পুঁথিপত্র সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে। ভারত-সহ আরও কয়েকটি দেশের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালে এটি আবার নালন্দা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এসো সংস্কৃত শিখি

কিং ভোঃ!

কি ব্যাপার!

ভবন্তং কুত্রাপি দৃষ্টবান্।

আপনাকে কোথাও দেখেছি।

কুশলীম/কুশলিনী আস্মি।

(পুং/স্ত্রী) ভাল আছি।

কুত্র দৃষ্টবান্।

কোথায় দেখেছেন?

তত্রৈব দৃষ্টবান্ স্যাত্।

ওখানেই হয়তো দেখেছেন।

ভালো কথা

দাদুর চশমা

আমার দাদুর অনেক বয়স। বেশি হাঁটাচলা করতে পারে না। বিকেলবেলা মাঝে মাঝে এদিক সেদিকে ঘুরে আসেন। একদিন নিজের চশমাটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমরাও অনেক খুঁজলাম কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। দাদু তখন বললেন— বিকেলে বেড়াতে গিয়ে হয়তো ফেলে এসেছি। আমি তখন দাদু কোথায় কোথায় গিয়েছে জেনে খুঁজতে বেরোলাম। প্রথমে পাড়ার চায়ের দোকানে। সেখানে যেতেই দোকানি হেসে বলল— দাদুর চশমা নিতে এসেছো? কাল বিকেলে ফেলে গেছেন, আমি তুলে রেখেছি। তিনি চশমাটা আমার হাতে দিলেন।

দীপ কর্মকার, খান্না, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) প ত অ রা

(২) শ ধ্য দে ম

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ল ক গু মু

(২) রা ন্ধ স জ

১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) রজতশুভ্র (২) আনন্দধারা

১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) ঊনবিংশ (২) প্রতাপাদিত্য

উত্তরদাতার নাম

(১) দীপান্বিতা পাল, দৌলতপুর, দঃ দিনাজপুর

(২) তুহিন কুমার বিশ্বাস, গাজোল, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

সৌর-মাতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তানজানিয়াতে বেশ কয়েকটি সরকারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাতে ভারত এবং তানজানিয়ার মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গ্রাম্য আফ্রিকান মহিলাদের বৈঠক। এই মহিলারা অতি সাধারণ হলেও অসামান্য তাঁদের কার্যে, উৎসাহে ও উদ্যমে। তাঁরা নিজেদের দেশে তথা সমগ্র বিশ্বে শক্তি সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের পক্ষে ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের এই

কাজ জীবাশ্ম থেকে পাওয়া শক্তির সংরক্ষণ করছে, পরিবেশ দূষণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সৌরশক্তিকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রেরণা জোগাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান যুগে আধুনিক জীবনযাত্রায় আমরা বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক বা জীবাশ্ম থেকে পাওয়া শক্তি চালিত সরঞ্জামের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি; অথচ তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ তৈরির পদ্ধতি বেশ জটিল এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে। অপরদিকে, কাঁচাতেল বা জীবাশ্ম থেকে পাওয়া শক্তি সীমিত। এর ওপর আছে সেগুলি ব্যবহার করার কুফল, পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। ওইগুলি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থ পরিবেশে উৎসর্জিত হয়, সেগুলি জীব, জন্তু, মানুষ সবার ওপরেই কুপ্রভাব বিস্তার করে। এইসব কারণে বিশ্বের প্রথিতযশা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যখন জায়গায়- জায়গায় প্রোটোকল, সেমিনার, কনফারেন্সে বিমানে করে ভ্রমণ করে, পাঁচতারা হোটেলের বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত থেকে জনসাধারণের অর্থে আত্মতৃপ্তি ভোগ করেন, তখন এইরকম সাধারণ মহিলারা তাঁদের নিজেদের দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে সৌরশক্তির বাস্তব এবং ব্যাপক ব্যবহার শেখাচ্ছেন এবং অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন সূর্যের এই অসীম শক্তিকে আমাদের অত্যাধুনিক জীবনযাত্রায় ব্যবহার করতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছ'টি আফ্রিকান দেশের তিরিশজন সৌরমাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রকৃতপক্ষে, সৌরমাতারা (Solar mammas) সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করার কাজে অগ্রণী আফ্রিকান মহিলাদের একটি গোষ্ঠী। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াবার এবং উৎসাহ প্রদান করার জন্য রাজস্থানের আজমিরের কাছে তলোনিয়াতে 'বেয়ারফুট উম্যান ভোকেশনাল ট্রেনিং কলেজ'-এর মাধ্যমে এঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক মহিলা সোলার-ইঞ্জিনিয়ার সার্থকভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মরতা। এঁরা সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি এবং আরও অনেক রকমভাবে প্রয়োগ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা কেবলমাত্র সৌরশক্তি চালিত যন্ত্রাদিই দেখাননি, বরং সেগুলি কীভাবে বানাতে হয়, খারাপ হলে কীভাবে সেগুলি সারিয়ে নেওয়া যায়, তাও দেখান। সৌরশক্তি চালিত মেশিনগুলি দেখাশুনার ব্যাপারেও তাঁরা নরেন্দ্র মোদীকে অবগত করান।

আমরা জানি যে, আমাদের দেশের একটি বিশাল অংশ বছরের বেশিরভাগ সময় প্রচুর পরিমাণে সূর্যের কিরণ পায়। এই সৌরশক্তির সার্থক প্রয়োগ করে আমরাও অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদের সাশ্রয় করতে পারি এবং পরিবেশকে দূষণ থেকে বাঁচাতে পারি। আজমিরের এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক মহিলাকেই স্বাবলম্বী করে তোলার কাছে সহায়তা করছে। এখান থেকে প্রশিক্ষিত মহিলারা আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় 'সৌরমাতা' নামে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁদের কার্যকুশলতাই আজ তাঁদের এই উপাধি প্রদান করেছে। ঘরের কাছে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি তৈরি করা, সারানো, সেগুলির যত্ন নেওয়া— সবকিছুর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এই সৌরমাতারা। প্রাকৃতিক শক্তির সার্থক এবং ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের এই অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

অতিথি কলম

চরমপন্থী ইসলামকে সামলানোর পথ কী?

চেতন ভগত

দু'বছর আগের লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদী-রাহুলকে কেন্দ্র করে যেমন তীব্র প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, দেশে দেশে টেলিভিশনগুলিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে হিলারি- ট্রাম্প দ্বন্দ্ব সেই রকমই উত্তাপ তৈরি করছে। অবশ্যই মার্কিনদেশের নির্বাচনে টাকার অঙ্কের জড়িত থাকার পরিমাণ বহু গুণ বেশি আর প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা তো বিশাল গুরুত্বের। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা বলবৎ থাকায় মনোনয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিজস্ব পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এবারের নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের মুখে আম নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি। এই সূত্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রিপাবলিকান ট্রাম্পের সাহসী সমাধান হচ্ছে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জন্য আমেরিকার দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া। প্রত্যাশা অনুযায়ীই এমন একটা আক্রমণাত্মক এবং আদ্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যে সর্বদা রাজনৈতিকভাবে সঠিক অবস্থানে থাকা ও তথাকথিত সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলা মার্কিন মুলুকে তুমুল বিতণ্ডা উসকে দিয়েছে। আর ট্রাম্পের এই মুসলমান বিরোধী প্রস্তাবকে নস্যাৎ করতে ও তাঁকে সর্বৈব ভ্রান্ত প্রমাণ করতে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন সরাসরি ইরাক যুদ্ধে নিহত এক আমেরিকান-মুসলমান সৈন্যের বাবাকে তাঁর প্রচার মঞ্চে হাজির করেছেন। ট্রাম্প অবশ্য নির্বিকার ও নিজ বক্তব্যে অটল। তিনি পাল্টা টুইট করে বলেছেন, চরমপন্থী ইসলামের (র‍্যাডিক্যাল ইসলাম) মধ্যেই জন্ম হয়েছে সন্ত্রাসবাদের। এই র‍্যাডিক্যাল ইসলাম কথাটাই হিলারি কখনও মুখে আনবেন না।

এই পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে অর্ধেক আমেরিকা ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। অনেক ইউরোপবাসীও এমনই ধারণা পোষণ করে থাকেন। আমি নিশ্চিত বহু ভারতীয়ও এই একই ধারণার পৃষ্ঠপোষক যদিও মুখে তা প্রকাশ করেন না। চরমপন্থী ইসলামের তত্ত্বই যে সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা এ কথার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি দেখা যাক : পৃথিবীকে বিহ্বল করে দেওয়ার মতো যত বড় বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা সংগঠিত হয়েছে তার সবই হয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। ফলে এটা বোঝা শক্ত নয় যে ইসলাম অনুগামীদের একটা অংশের চিন্তাধারায় বড়সড় গণ্ডগোল রয়েছে আর এদেরই চরমপন্থী ইসলামি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আর এ বিষয়টিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে যদি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে হয়, তাহলে বলতেই হবে ইসলামের যে বৃহত্তর অংশ তারাও কিন্তু এই চরমপন্থীদের অদৃশ্য মদত দিচ্ছে বা না দেখার ভান করে অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল ধর্মের একটি উপশাখা হিসেবে চরমপন্থী ইসলামকে আদতে নীরব মান্যতাই দিচ্ছে।

অনেকে বলে থাকেন ধর্মগ্রন্থের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যার কারণেই এমনটা ঘটছে। আবার অনেকে বলেন, ধর্ম বরাবরই এমনই অনমনীয় ও প্রকৃতিগতভাবে গোঁড়া যে তা কখনই পরিবর্তনশীল বা নতুন কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে যায় না। এই কারণেই এর পরিবর্তন ও সংস্কার জরুরি।

উদারবাদীদের প্রদত্ত যুক্তিগুলি এরকম : সমগ্র বিশ্বের ১৬০ কোটি মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ৯৯.৯ শতাংশই আর পাঁচজন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, কদাচ মানুষ খুন করতে যান না। তাই ইসলামকে খারাপ বলা বা এর ধাঁচায় পরিবর্তন আনা বা বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক এমন একটা নিদান দিয়ে একটি ধর্মের সমস্ত মানুষকে কোনো দেশে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আদতে বর্ণবিদ্বেষপরায়ণতারই সমান এবং একইসঙ্গে হাস্যকরও বটে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ 'ইসলামিক স্টেট' (আই এস) প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী অসহায় মানুষকে হত্যা করে, দেশে দেশে নির্বোধ ধ্বংসলীলা চালায় তখন কিন্তু সত্যিই এসব যুক্তির মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজা দুষ্কর মনে হয়। আমরা সকলেই জানি, ভয়ের মুখে মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় আত্মরক্ষার। এরই প্রতিক্রিয়ায় সেই সমস্ত বিষয় যার সঙ্গে ক্ষীণভাবেও জড়িত আছে ভয়ের অনুষঙ্গ, মানুষ তাঁর থেকে যোজন দূরে সরে যেতে চায়। বন্ধ করে দিতে চায় সমস্ত প্রবেশপথ। আমেরিকা আজ মনে হয় সেই প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের কাছে ট্রাম্পের ঘোষণা এতটা উদ্দীপনাময় বলে মনে হয়েছে তা সে যতই সাম্প্রদায়িক চরিত্রের হোক না কেন।

মনে রাখতে হবে, যখন মানুষ একান্তই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে অন্য কারুর কথা ভাবা বা (inclusive politics) সঙ্গে নেওয়ার প্রশ্ন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় নিজেকে বাঁচাবার সহজাত প্রবণতার সঙ্গে যুক্তিবাদিতার এক অন্তর্লীন যুদ্ধ পরিচালনা করা। ধরা যাক আপনার পাড়াতে এক অত্যন্ত লম্বা সিরিয়াল কিলারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। খবরটা শোনার পর থেকেই বেশি লম্বা অপরিচিত লোক দেখলেই আপনার ভেতরে চাপা আতঙ্ক অনুভূত হতে শুরু করে। তার মানে তো আর এই নয় যে সব লম্বা লোকই সিরিয়াল কিলার। কিন্তু মানুষের মন ও

হৃদয়ের গতি বড় বিচিত্র। তারা কিন্তু বিষয়টা এভাবেই নেয়।

একই সঙ্গে এই কথাটাও বোঝার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে যে ইসলামের নামে যে বীভৎস ও চরম সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু কখনই শুধুমাত্র ধর্মকেন্দ্রিক হতে পারে না। বিশ্বের নানা প্রান্তে অগণতান্ত্রিক ধনবান ও নানা সম্পদে বলীয়ান একনায়কতন্ত্র চালানো একশ্রেণীর শাসকরাই ইসলামের নামে এই হত্যালীলা চালাচ্ছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও তার বন্ধু দেশগুলিতে দুর্বৃত্ত চরিত্রের শাসকরা গদীয়ান। এরাই ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের নিজেদের মতো শয়তানী সংস্করণ প্রয়োগ করে। তাদের শাসনে গণতন্ত্রের অভাব, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অবিমিশ্র হিংসার দাপটকে নিজেদের স্বার্থে জারি রেখেছে।

এখানে ভুলে গেলে চলবে না কমবেশি সব ধর্মেই হিংসাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের মধ্যেও হিংসার পঙ্‌ক্তি আছে। হিন্দু শাস্ত্রের কিছু কিছু জায়গায় আজকের ধারণা মতো নারীর সমান অধিকার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় শ্লাঘার কথা এই দেশগুলিতে কোনো কোটি কোটি পেট্রোডলারের অধিকারী সশস্ত্র একনায়ক নেই যারা ধর্মগ্রন্থগুলির মতলবি ব্যাখ্যা দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের গলা টিপে মারাকে আড়াল করবে। গুনতি করলে দেখা যাবে ইসলামের আওতায় এমনই বহু দেশ আছে যেখানে কোনো পরিবর্তন আনতে গেলেই হিংসার প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশের মতো নিজের কোনো বিরুদ্ধ মত থাকলে তা প্রকাশ করতে রামলীলা ময়দানে গিয়ে বা টুইট করে বোঝানোর কোনো প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। সেই সব দেশের সংবাদ বা ভিন্নমত নিয়ে শাসকবিরোধী কোনো বিতর্ক চলে না। শাসকের ভুল ধরিয়ে দেওয়া চলে না, একান্তই যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হয় তবে বন্দুক ধরতে হবে।

আজ মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে আই এস-এর উত্থান সমেত তার মূল রয়েছে এই অঞ্চলের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে। এই দেশগুলির এক একটির মাথায় বসে আছে এক একজন গুণ্ডাপতি। একজন গুণ্ডাপতি আর একজনকে হঠাতে সবসময় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু তাদের কারুরই ক্ষমতায় থাকাটা জনতার অনুমোদিত নয়, তাই তাদের খুন জখম ও নিরন্তর লড়াইকে বৈধতা দিতে তারা সবই আল্লার নামে চালাতে চায়। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের কথা, আমেরিকা এইসব দলপতি পরিচালিত দেশগুলির বন্ধু শুধু নয়, বহু ক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়াকলাপের সমর্থকও বটে। এর কারণ বহু প্রাচীন সেই তেলের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করা। এটা করতে গিয়ে তারা এই সব দমনমূলক রাষ্ট্রকে ও তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে পরোক্ষে সমর্থনও করেছে। ফলে তারা আরও শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তাই ধর্মের নামে যত বেশি স্বৈরতন্ত্র কায়েম থাকবে ততই বেড়ে চলবে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদের টুঁটি চেপে ধরতে আমেরিকাকে তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিজের দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেই হবে না। সত্যিই যদি 'চরমপন্থী ইসলাম' বলে কিছু থাকেও তবে তাকে দুর্বল করতে হবে। যেমন খৃস্টানদের মধ্যেও চরমপন্থী খৃস্টান বা হিন্দুদের মধ্যে চরমপন্থী হিন্দুরা আছে। কিন্তু তারা নেহাতই দুর্বল। কারণ তাদের দাপিয়ে বেড়াবার জন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তি ও সামরিক শক্তির মদত নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মুসলমানরা বিশেষ করে যারা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিধিতে বাস করে তাদের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি একটু কঠিন। আগেই বলেছি, মনুষ্য চরিত্রের ভয় প্রবণতার ফলে তারা অনেক সময়ই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে সব চেয়ে ভাল তারা যেটা করতে পারে তা হলো নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করা, সেইসঙ্গে অত্যাচারী শাসকদের দেশে থাকা অন্য মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে, কেউই কখনও কোনো সহিংস সংগঠন বা ব্যক্তি বা সরকার যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং সর্বদা মানবাধিকার ধ্বংস করে তাদের সমর্থন করে না। যতই তারা সেই কাজ আপনার আরাধ্য ভগবানের দোহাই দিয়ে চালাক না কেন।

ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশে দেশে যত একনায়কতন্ত্র শেকড় ছড়াবে ততই বাড়বে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের দাপট। ট্রাম্প ও ক্লিন্টন, বিজেপি ও কংগ্রেস, রক্ষণশীল ও উদারবাদী সকলেই আজকের পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছে। তাই এর সমাধানও যৌথভাবে করা ছাড়া উপায় নেই। এ ভুল করছে, আমি ঠিক করছি—এমন দোষারোপে কোনো লাভ হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট ভাষ্যকার)

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS......

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

যুগসন্ধিক্ষণে নেপাল : এবার কোন পথে?

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনো মানুষের জীবননাট্যে কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি তাকে গ্রহণ করতে হয়, তখন নিজ বুদ্ধিবলে তাকে সেই সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করতে হয় যে সিদ্ধান্তটি তার জীবনকে পৌঁছে দেবে সাফল্যের শীর্ষ শিখরে। আর সেই সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করতে হয় যে সিদ্ধান্ত তাকে পৌঁছে দেবে ব্যর্থতার কানাগলিতে। কোনো নদী তার যাত্রাপথে কখনও কখনও এমন জায়গায় আসে যে জায়গা থেকে তার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি দিকে প্রবাহিত হতে পারে। একটি পথে গেলে সে হয়তো মরুপথে ধারা হারাবে, অন্য পথে গেলে হয়তো সমুদ্রাভিমুখী হয়ে তার প্রবাহ সার্থক হবে। নিজে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী সে নয়, তাই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় ভাগ্যেরই ওপরে। কখনও কখনও রাষ্ট্রের জীবনেও আসে এমন মুহূর্ত যখন জাতিকে বেছে নিতে হয় দুটি পথের মধ্যে সেই পথটিকে যে পথ জাতিকে নিয়ে যায় সমৃদ্ধির পাহাড়চূড়ায় আর বর্জন করতে হয় সেই পথটিকে যে পথ জাতিকে প্রবেশ করায় ব্যর্থতার পাতালগহ্বরে। প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্র হলো নদী ও ব্যক্তিমানুষের সম্মিলিত রূপ, ব্যক্তিমানুষের মতো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী সে কিন্তু ব্যক্তিমানুষের মতো একক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী নয়। আবার নদীর মতো চিরপ্রবহমাণ কিন্তু তাঁর মতো ভাগ্যনির্ভর নয়। নেপালও সেরকম এক রাষ্ট্র এবং তার জীবনে এখন এসেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই চরম মুহূর্ত যাকে বলা যায় যুগ-সন্ধিক্ষণ।

নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। প্রাচীন যুগে নেপাল ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত তৎকালীন ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল নেপাল। হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত এই অতিক্ষুদ্র দেশটির থেকেই আমরা পেয়েছি বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণস্বরূপ বুদ্ধদেবকে। অনেক পরে মধ্যযুগে আলাউদ্দিন খিলজির বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত চিতোর গড়ের অবশিষ্ট সৈন্যের একাংশ নেপালে পালিয়ে যায় ও সেখানে নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। চিতোরের মতোই তারাও নিজেদের রাজাকে রাণা বলে। আর তাদের জাতিগত নাম ছিল গোরক্ষা (অগ্নিপরীক্ষা, জগদীশ চন্দ্র বসু)। মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশের গো-সম্পদ রক্ষা করাকে তারা নিজেদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাই নিজেদের জাতির নাম দিয়েছিল গোরক্ষা বা গোরখা, তার থেকেই অপভ্রংশে এসেছে বর্তমান গুর্খা শব্দটি। ভারতের ৮০০ বছরের পরাধীনতার (প্রথম ৬০০ বছর মুসলমান পরাধীনতা আর পরে ২০০ বছর ইংরেজ পরাধীনতা) সময়ে নেপাল কখনো পরাধীন হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ

নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল ও সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি।

শিখার মতো। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও নেপালের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল প্রথম ৫৫ বছর। কিন্তু গত দেড় দশকে নানাবিধ রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ভারতের সঙ্গে নেপালের সেই মধুর সম্পর্কে চিড় ধরেছে, বর্তমানেও ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অম্লমধুর। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। চিরকাল ঐক্যবদ্ধ নেপালে এখন চরম জাতিবৈর দেখা যাচ্ছে চীনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে। মধেশীয়, থারুয়ান, গোরখা প্রভৃতি নানা জাতিগোষ্ঠীতে আজ নেপাল সমাজ বিভক্ত। তার ওপর মধেশীয়দের ওপর হচ্ছে চরম বিমাতৃসুলভ আচরণ, কারণ তারা নাকি ভারতীয়। বিধাতার কী অদ্ভুত পরিহাস, যে দেশের সকলেই কোনো না কোনো সময়ে ভারত থেকেই সেখানে গেছে সেই দেশে ভারতীয়-অভারতীয় দ্বন্দ্ব (কমিউনিস্ট মগজধোলাইয়ের কী অপূর্ব নিদর্শন)! তাই বলা যায় নেপালের ভাগ্যে এখন এসেছে যুগ- সন্ধিক্ষণ। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে নেপাল ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে— চিরন্তন প্রতিষ্ঠার পথে, না চরম ধ্বংসের পথে।

নেপালের অভ্যন্তরীণ কূটনীতিতে এখন বিরাট উথাল-পাথাল সময়। চীনঘেঁসা প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি শর্মা সদ্য প্রাক্তন হয়েছেন। কঠোর বচনে অভ্যস্ত এই প্রধানমন্ত্রীর (তার মুখনিঃসৃত বাক্যবাণকে অনেকেই ওলি কা গোলি বলতেন) প্রস্থানে অনেকেই উল্লসিত। তার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মাওবাদী নেতা পুষ্পকুমার দহল বা প্রচণ্ড। আর তাঁকে সমর্থন করছেন নেপালি কংগ্রেসের নেতা শের বাহাদুর দেউবা। তাঁরা দুজন ৯ মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রীর আসন ভাগ করে নেবেন। হাকিম বদলাচ্ছে অর্থাৎ হুকুম বদলাবে অবশ্যই, কিন্তু সেই বদল হবে কোন দিকে? চীনাপন্থী প্রধানমন্ত্রী বিদায়ে নেপালের বিদেশনীতি কি আবার ভারতমুখী হবে, না চীনের দিকেই ঝুঁকবে? নেপাল ভারতের

সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনবে অতীতের মতো, না চীনের অলীক প্রলোভনে পা দিয়ে আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত এই উপমহাদেশের চরম সর্বনাশ সাধন করবে? প্রশ্নটি উঠছে কারণ এখানে হাকিম দু'জন আর তাঁদের অতীত হুকুমও দু'রকম ছিল। মাওবাদী নেতা পুষ্পকুমার দহল বা প্রচণ্ড ঘোষিতভাবেই চীনপন্থী এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতা শের বাহাদুর দেউবা নিজের দেশের মিডিয়ার কাছে পরিচিত মার্কিনঘেঁসা হিসেবে। কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী এই নেতা মাওবাদী পরিচালিত সরকারবিরোধী জনযুদ্ধের সময় প্রচণ্ডর মাথার ওপর ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কারমূল্য ধার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ মতাদর্শগতভাবে চরম বিরোধী এই দুই নেতা একত্রে কোন পথে সরকার চালান তা এখন সারা বিশ্বের অন্যতম কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোট সরকারের দ্বারা রাষ্ট্র- পরিচালনা অবশ্য কূটনৈতিক বিশ্বে নতুন নয়। কিন্তু সেইসব জোট সরকারে জোটকারী দলগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও মতাদর্শগত কিছু মিল অবশ্যই ছিল। সেই মিলগুলির ওপর ভরসা করে পারস্পরিক বিরোধিতার বিষয়গুলিকে আপাতভাবে দূরে সরিয়ে তারা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করেছিল এবং সেই কর্মসূচির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র-পরিচালনা করেছিল। কিন্তু বর্তমান নেপালে জোটকারী দলদ্বয়ের মধ্যে মতাদর্শগত কিছুমাত্র মিল নেই। কাজেই তারা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করবে কীভাবে তা সত্যিই কূটনৈতিক মহলে এক অভূতপূর্ব চিন্তার সৃষ্টি করেছে। বিশ্লেষণে দেখা যাক তারা কী কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রথমত, যদি নেপাল প্রচণ্ডর মতানুসারে চলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ চীনপন্থী হয়ে যায় এবং নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে শের বাহাদুর দেউবা গদির লোভে প্রচণ্ডর অবস্থানকে সমর্থন করে, তাহলে নেপালের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ এবং মদেশীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারাবেন। দেউবা তাতে পরবর্তীকালে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গুরুত্ব হারাবেন। অতএব এরকম কোনো কাজে প্রচণ্ডকে সমর্থন তিনি করবেন না। দ্বিতীয়ত, যদি উল্টোটা হয় অর্থাৎ যদি শের বাহাদুর দেউবা তাঁর মতানুসারে দেশকে পরিচালনা করেন, দেশকে সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করেন এবং গদির লোভে প্রচণ্ড নিজের বর্তমান অবস্থান-চ্যুত হয়ে শের বাহাদুর দেউবাকে সমর্থন জানায় সেক্ষেত্রে নেপালের বামপন্থী মানুষরা (চীনের দীর্ঘদিনের মগজধোলাইয়ে যাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে) প্রচণ্ডর ওপর আস্থা হারাবে যা প্রচণ্ডর পক্ষে রাজনৈতিক আত্মহত্যার সামিল হবে। অতএব একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নেপালের রাজনৈতিক রসায়নে এই সমীকরণ আগামীদিনে বাস্তবায়িত হবে না। তৃতীয়ত, যদি মাঝামাঝি কিছু হয় অর্থাৎ নেপাল সম্পূর্ণ চীনপন্থীও হলো না আবার আমেরিকা-ঘেঁসা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিও পুরোপুরি প্রয়োগ করলো না, দুয়ের মাঝামাঝি এক ভারসাম্যের পথ বেছে নিল। বিপদ কিন্তু সে পথেও কম নয়। সোনার পাথরবাটি মার্কা সেই খিচুড়ি-অর্থনীতির দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশসাধন সম্ভব নয়। আর দেশের অর্থনৈতিক বিকাশসাধন না হলে দেশের সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের হতাশা-জনিত কারণে শের বাহাদুর দেউবা ও প্রচণ্ড উভয়েরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ পথ অতএব উভয়ের দ্বারাই পরিত্যাজ্য হবে।

তাহলে উপায় কী? উপায় আছে এবং তা চিরন্তন পথে অর্থাৎ সেই ভারত-নির্ভর কূটনীতির পথেই আছে। নেপাল যদি দু'দশক আগের মতো ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনে তাহলে এক ঢিলে তিন পাখি মারা যাবে। প্রথমত, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় নেপালের অর্থনৈতিক বিকাশহার অক্ষুণ্ণ থাকবে, ফলে নেপালের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উচ্চাশা পূর্ণ হবে। তারা বর্তমান সরকারের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখায় নেপালের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ এই সরকারকে সমর্থন করবে এবং মধেশীয় জনগোষ্ঠী এই সরকারের অন্যতম সমর্থক হয়ে দাঁড়াবে। তৃতীয়ত, ভারতীয় অর্থনীতির ছত্রছায়ায় থাকলে নেপালের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু সেই বৃদ্ধির সঙ্গে মার্কিন আগ্রাসনের কুপ্রভাব না থাকায় নেপালের বামপন্থী মানুষেরা চীনের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভারত-অনুরাগী হয়ে পড়বে। সেইসঙ্গে চীনের স্বার্থপ্রণোদিত মগজধোলাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবে, থারুয়ান ও অন্য জনগোষ্ঠীসমূহও নিজেদের ভুল (কমিউনিস্ট বিজাতীয়তাপ্রসূত) বুঝতে পেরে নিজেদের সাংস্কৃতিক উৎসভূমি ভারতের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইবে এবং চীনের ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত অন্তর্কলহ থেকে নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে।

পতন ডানদিকে হলেও পতন, বামদিকে হলেও পতন। কোনোদিকেই পতিত না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই সর্বদা উচিত। সে কারণেই বামপন্থী (চীনপন্থী) বা ডানপন্থী (আমেরিকাপন্থী) না হয়ে ভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই নেপালের এখন অবশ্য কর্তব্য।

একটি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের পরিচালনায় ৫টি গ্রাম বিকাশ সমিতির মাধ্যমে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী সংলগ্ন ১২টি গ্রামে ৭০টি নিত্য ও নৈমিত্তিক সেবা ও সংস্কারমূলক প্রকল্প চলছে।উক্ত সেবা প্রকল্পগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাজপুর গ্রামে ৭ কাঠা জমির উপর ৯০০ স্কয়ার ফুট পুঞ্জের কার্যালয় 'সারদা ভবন' নির্মাণের কাজ চলছে, যার নিচের তলে বিভিন্ন সেবা প্রকল্প কক্ষ, উপরে শ্রীরামকৃষ্ণ সভাগৃহ। স্বহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে এই 'সারদা সেবা ভবন' নির্মাণকল্পে মুক্ত হস্তে দানের জন্য আহ্বান জানাই।

—: চেক বা অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা :—

SRI RAMKRISHNA SARADA GRAM
BIKASH PUNZA
A/C-0321010768634,
IFSC-UTBIOKPK936
MICR CODE-712027501,
PHONE NO.-9153722606

কেন ভারতের দরকার নয়া শিক্ষানীতি

টি এস আর সুব্রহ্মনিয়ন

১৯৮৬ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি, যার সমীক্ষা হয়েছিল ১৯৯২ সালে, এখনও পর্যন্ত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকনির্দেশক দলিল হিসেবে তা কাজ করছে। এটি ছিল ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির অনুবর্তী, যাকে বলা হয় স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি। তবে বৃটিশ আমলেও ১৯৩৮ সালে 'ওয়ার্ধা শিক্ষাসূচি' (মহাত্মা গান্ধীর নয়া তামিল) একটি 'জাতীয় নীতি'র পরিকল্পনা করেছিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি তা গ্রহণের জন্য সুপারিশও করেছিল। কেব (সি এ বি ই) কমিটির ১৯৪৪ সালের 'ভারতে যুদ্ধ পরবর্তী শৈক্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা' ('সার্জেন্ট প্ল্যান') শীর্ষক প্রতিবেদনেও শিক্ষার 'ভারতীয়করণ', প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্বজনীনকরণ এবং সর্বোপরি গুণগত মান বৃদ্ধির কথা বলা রয়েছে।

১৯৮৬-'৯২ সালের শিক্ষানীতি প্রাচ্যবিদ্যার ধারণায় বলীয়ান হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য পরিণাম সংঘটিত করতে পারেনি। উপরোক্ত অগ্রগণ্য বিষয়গুলি এবং একগুচ্ছ কর্মসূচির রক্ত-আধিক্যতা সত্ত্বেও দেশে বর্তমানে শিক্ষার অবস্থা সমাজের একটি দুর্বল স্থান হিসাবেই চিহ্নিত। অধিকাংশ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখনও অবধি সঠিকভাবে এমনকী আংশিকভাবেও উপলব্ধি করা যায়নি, মূলত কর্মক্ষম রোডম্যাপ ও ক্রমাগত প্রয়োগ-সংক্রান্ত নির্দেশনার অভাবে। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, প্রয়োগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিটি স্তরে অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণ, এমনকী গ্রাম বা ব্লক স্তরেও; এর সঙ্গে জুড়েছে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, যা শিক্ষা প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে— এটাই হলো গত তিন দশক বা ওইরকম সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি।

যে-কোনো গণতন্ত্রে শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যই হলো সম্ভবত উন্নয়নের দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু গত কয়েক দশকের বাস্তবতা বলছে এই দু'টি ক্ষেত্র তাদের প্রাপ্তব্য গুরুত্বের সিকিভাগও লাভ করেনি। ক্ষেত্র দু'টি যে ফোকাসের দাবিদার ছিল তা জোটেনি তাদের কপালে। আজ বাস্তব পরিস্থিতি হলো, হতাশাজনকভাবেই, জারি করা নীতি খতিয়ে দেখার থেকে আমরা অনেক দূরে। যখন বিদ্যালয়ে এবং একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামগ্রিকভাবে নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, তার পাশাপাশি কিছু অবাঞ্ছিত নতুন সমস্যারও উদয় হচ্ছে। যদিও বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত সুবিধার তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষাদান বা শিক্ষা-পদ্ধতির যোগ খুব সামান্যই রয়েছে। অন্যদিকে, এ নিয়ে ক্রমাগত তথ্যানুসন্ধান স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফলের দ্রুত অবনমনের বিষয়টি উদ্বেগজনকভাবে তুলে ধরছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ন্যূনতম মানের শিক্ষাদানের ব্যর্থতা ব্যক্তিমালিকানাধীন কিংবা 'সাহায্যপ্রাপ্ত' বিদ্যালয়গুলির অনুপ্রবেশের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে, এমনকী গ্রামীণ এলাকাতেও, কিন্তু এর ফলাফলও তাৎপর্যজনক ভালো কিছু হয়নি। আর এই কারণে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অধিকাংশই অভিন্ন মানের এবং এই শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণত যেসব ডিগ্রী ছাত্রছাত্রীরা লাভ করছে, সঙ্গত কারণেই সে নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা যায়। নথিভুক্তিকরণ ও প্রবেশের অধিকারের তাৎপর্যলাভ সত্ত্বেও, গুণগতমানের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ক্রমাগত উদ্বেগ আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। 'সার্বিক' (ইনক্লুসিভ) শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোনো গভীর ও চিন্তাশীল আলোচনা হয়নি।

> "শিক্ষার উন্নতিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত স্তরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ বা কমানোরও দরকার। তা হলে মাত্র একটি প্রজন্মের ব্যবধানে ভারত নিজেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-মানে উন্নীত করতে পারবে।"

দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি), বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রথম (এ এস ই আর) এবং অবশ্যই গুজরাটে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে গৃহীত কর্মসূচি 'গুণোৎসব' গত পনেরো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে শিক্ষার মান ও শিক্ষানীতির কার্যকারিতা নির্ধারণে নিয়োজিত। তাদের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন রীতিমতো হতাশাজনক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এ এস ই আর ২০১৪ সাল নাগাদ লক্ষ্য করে যে অষ্টম শ্রেণীর প্রায় ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়াও বলতে পারে না। গ্রামীণ স্কুলে সেই সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যাদের অক্ষর-পরিচয় নেই— ২০১০ সালে এই সংখ্যাটি ছিল মোট ছাত্র-সংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ। ২০১৪-য় তা পৌঁছে যায় ৩২.৫ শতাংশে। ২০১০ থেকে ২০১২ এই দু'বছরে সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর পঠন ক্ষমতারও দ্রুত অবনমন লক্ষ্য করা গিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর অর্ধেক ছাত্রছাত্রীরই সেই পঠন-দক্ষতা নেই, যা অর্জিত হওয়ার কথা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতেই। ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী তাদের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে ফেলছে গণিত বিষয়ে কোনো ন্যূনতম দক্ষতা ছাড়াই। সুতরাং আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষত কতটা গভীর তা বোঝানোর জন্য আর কোনো মন্তব্যের দরকার পড়ে না এবং এর দ্রুত ও জরুরি সংস্কার প্রয়োজন।

যখন শিক্ষার অধিকার আইন নথিভুক্তিকরণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, একইসঙ্গে তা জোর দিয়েছিল শিক্ষার পরিকাঠামো বৃদ্ধিতেও। এখন নতুন দিক হিসাবে তা কার্যকরী করার বিষয়টি উঠে আসছে। যা নিয়ে বলা প্রয়োজন। বিশেষ করে, 'বন্দী-নীতি নয়'— এর পুনর্ভাবনা দরকার, যা দৃশ্যত এবং আইনগতভাবে যাতে কার্যকরী হয় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থার যোগদানের বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো নীতি নেই, না বিদ্যালয় স্তরে, না উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে, সেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ও জন-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ঠিক কী হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। তত্ত্বগতভাবে এহেন শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা খালি একটি মন্ত্রই জপতে শিখেছি যে, শিক্ষা 'ব্যবসা' নয়। অর্থাৎ লাভের মানসিকতা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কখনোই কোনো নির্ণায়ক নীতি হতে পারে না। কিন্তু আমাদের জীবনের অন্যান্য আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতোই এই ধরনের ধ্যান-ধারণার থেকে বাস্তবটা অনেক পৃথক। গত দু'দশকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাত্রাতিরিক্ত বাড়বাড়ন্তের পেছনে 'ক্যাপিটেশন ফী'র ভাবনা সযত্নে লালিত হয়েছে, যার ফলে কালো টাকার আমদানি বেড়েছে এবং তার ছায়াপাত ঘটেছে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও। একইসঙ্গে এটাও সত্য যে, এরকম বহু তথাকথিত 'দাতব্য শৈক্ষিক অছি পর্ষদ' (চ্যারিটেবল এডুকেশনাল ট্রাস্ট) রয়েছে, যার পেছনেও আর্থিক উদ্দেশ্য কাজ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে রাজনৈতিক শ্রেণীর আর্থিক অনুদানের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই চিত্র শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক সংস্কারের লক্ষ্যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও।

শৈক্ষিক গবেষণার মান, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বিষয়গত একাত্মবোধ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যের হার, যা আশা করা গিয়েছিল তার থেকে অনেক কম। অগ্রসরমান ও স্পন্দিত শৈক্ষিক জগতের উন্নতির জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনই হলো মুখ্য বিষয়। এই জটিল জায়গাটি নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও তাৎপর্যপূর্ণ ভাগীদার হতে পারে।

উচ্চাভিলাষী সমাজে প্রত্যেক বাবা-মা-ই চাইবেন যে তাঁদের সন্তানেরা 'উন্নতমানের শিক্ষা' পাক। যদিও বৃত্তিগত ক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নয়নের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস আজ অবধি গৃহীত হয়নি। বোঝাই যায় আড়ে-বহরে শিক্ষা-সড়কের বৃদ্ধিতেও উপযুক্ত ডিগ্রীর অভাব ঘুচল না। গুণগত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মর্যাদা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিই এখন আশু কর্তব্য, যা আমাদের জরুরি মনোযোগ দাবি করছে।

একটি বড়োসড়ো নতুন আঙ্গিক তৈরি হয়েছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির আবির্ভাবের ফলে। নতুন এই কারিগরী শিক্ষা তথ্যের সম্প্রসারণে, দক্ষতার উন্নতিতে এবং এরকম আরও কিছু বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাকে কে না গ্রহণ করতে পেরেছে, বা মানিয়ে নিতে পেরেছে। সাজসরঞ্জাম-যুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য প্রভূত সুযোগ আমাদের সামনে— শিক্ষক তৈরি, ক্লাসরুমে শিক্ষক-প্রদান, সংশোধিত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই সুযোগগুলি এখনও অবধি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। 'বিরাট তথ্যসম্ভার' (বিগ ডেটা) ছাত্র খুঁজতে শিক্ষার ফলাফল জানতে কার্যকরী হতে পারে, শিক্ষকের মান যাচাইয়ে শিক্ষক-অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্র- ছাত্রীদের সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জানা যেতে পারে একক ভাবে বিদ্যালয়গুলির উন্নতির খতিয়ান— এই তালিকা ফুরোবে না। যদিও প্রযুক্তি ভারতে দ্রুতলয়ে পদক্ষেপ করছে, কিন্তু হয় তাকে ভীতি-বিহ্বল করবার চেষ্টা হচ্ছে, নতুবা ভারতীয় পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সৌভাগ্যবশত, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, বিশেষ করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বয়ং শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্গঠনের জন্য বড়ো উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং শীঘ্রই নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এটা অবশ্যই বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত। এটা আশা করা যায় যে, মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রকে নয়া দিশা দেখাবে। উদ্বেগজনকভাবে শৈক্ষিক মান-অবনমনের বিষয়টিকে রুখবে এবং মান-উন্নয়নে নতুন পথের সন্ধান দেবে। শিক্ষার উন্নতিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত স্তরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ বা কমানোরও দরকার। তা হলে মাত্র একটি প্রজন্মের ব্যবধানে ভারত নিজেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-মানে উন্নীত করতে পারবে। নতুন নীতির ঝুঁকিটি যদিও খুব বেশি কিন্তু এই শতকের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যেই ভারত শৈক্ষিক ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

(লেখক প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব। নয়া শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন। প্যানেলটি তার রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।)

৮২ বছরের বীরাঙ্গানা মীনাক্ষী গুরুক্কল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাঁচশো বছর আগের কেরল। আরব দস্যুরা কেরলের উপকূলে হানা দিয়ে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতো। সেই সঙ্গে নিয়ে যেত সুন্দরী বালিকা, যুবতী ও বয়স্কা মহিলাদের। বাধা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিরোধের মুখে তাদের যে পড়তে হোত না তা নয়। তবু আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েরাও তৈরি হতে শুরু করে। সে সময় উন্নিয়ার্চা নামে এক অসম সাহসিনী মহিলা এগিয়ে এলেন। বর্বর আরব দস্যুদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি মেয়েদের কালারিপায়ত্তু শেখানো শুরু করলেন। খুব বেশি না হলেও মেয়েরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হলো।

কালারিপায়ত্তু এক বিশুদ্ধ ভারতীয় যুদ্ধকৌশল। এখন জুডো, ক্যারাটে, কুংফু ইত্যাদি নামে বেশি পরিচিত। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা চীন, জাপান, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে এই ভারতীয় যুদ্ধকৌশল নিয়ে গেছেন। কালক্রমে ভারতে এই যুদ্ধকৌশল লুপ্ত হতে শুরু করলে একমাত্র কেরলবাসীরাই অনুশীলনের মাধ্যমে একে বাঁচিয়ে রাখেন। কেরলের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে এই বিদ্যার বহু সাধক এর সাধনা করে চলেছেন।

এমনই একজন সাধিকা শ্রীমতী মীনাক্ষী গুরুক্কল। আসলে তিনি মীনাক্ষী আয়াম্মার। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে গুরুক্কল বলে ডাকে। এখনও তিনি খালি হাতে (নিঃশস্ত্র অবস্থায়) তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে চলেছেন প্রতিপক্ষকে কীভাবে পর্যুদস্ত করতে হয়। খালি হাতে যুদ্ধের পাশাপাশি কালারিপায়ত্তুর আরেকটি অঙ্গ হলো অস্ত্র-সহ যুদ্ধ। তাই মীনাক্ষী গুরুক্কল কখনও ঢাল-তলোয়ার, কখনও লাঠি, কখনও নানচাকু, কখনও লম্বা চাবুক নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিখিয়ে চলেছেন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এই সব অস্ত্র। এখন তাঁর বয়স ৮২ বছর। মাত্র ছ' বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে ও তাঁর দিদিকে স্থানীয় এক কালারিতে ভর্তি করে দেন। সেই বয়সেই দক্ষতার সঙ্গে তিনি কালারিপায়ত্তুর জটিল সব কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন।

তখনকার প্রথানুসারে ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী রাঘবনও কালারিপায়ত্তু বিশেষজ্ঞ। ১৯৪৯ সালে তাঁরা দু'জনে কোঝিকোড়ের কাছে বতকরায় 'কদথনাদন কালারি সঙ্গম' নামে এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য— দেশ ধর্ম ও সমাজ রক্ষায় নিজেদের তৈরি করা। এত বছর ধরে তিনি সাধনার মতো এই যুদ্ধ কৌশল শিখিয়ে চলেছেন। ফলস্বরূপ কেরল ও তামিলনাড়ুর গ্রামেগঞ্জে কালারিপায়ত্তু ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। তাই আজ কেরলে ছেলে হোক বা মেয়ে তাদের বাবা-মা কালারিপায়ত্তু-র আখড়ায় ভর্তি করানোকে অবশ্য কর্তব্য মনে করেন।

অবাক হওয়ার ব্যাপার, কেরলে এই প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ কৌশলের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবেই নেওয়া যায়। এই প্রথারও প্রচলন করেন শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবী। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক রূপে শুরু করেন। 'কোর্স শেষ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা দক্ষিণাস্বরূপ যে দান দেয় তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্কুলান হয়'— জানালেন মীনাক্ষীদেবী। শুধু তাই নয়, সেই অর্থে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণও চলে।

১৬ বছর বয়সে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে আজ ৮২ বছর বয়সেও তিনি ক্লান্ত হননি। তাঁর কথায়— 'কখনই ক্লান্তি আসে না, যখন দেখি মার্শাল আর্ট জানা ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত সংযমী, চরিত্রবান, পরোপকারী এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করে তখন নিজেকে খুবই গর্বিত মনে হয়।' তিনি জানান, তার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তারাও মার্শাল আর্টে বিশেষজ্ঞ। বড় ছেলে সঞ্জীব ছ'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালান। মীনাক্ষীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেখা গেল, বছর বত্রিশের এক বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তিনি শাড়ি পরেই ঢাল-তলোয়ার হাতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মহড়া নিচ্ছেন। একটুও না হাঁফিয়ে তিনি জানালেন, 'যতদিন শরীর সঙ্গ দেবে ততদিন প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাব।' দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

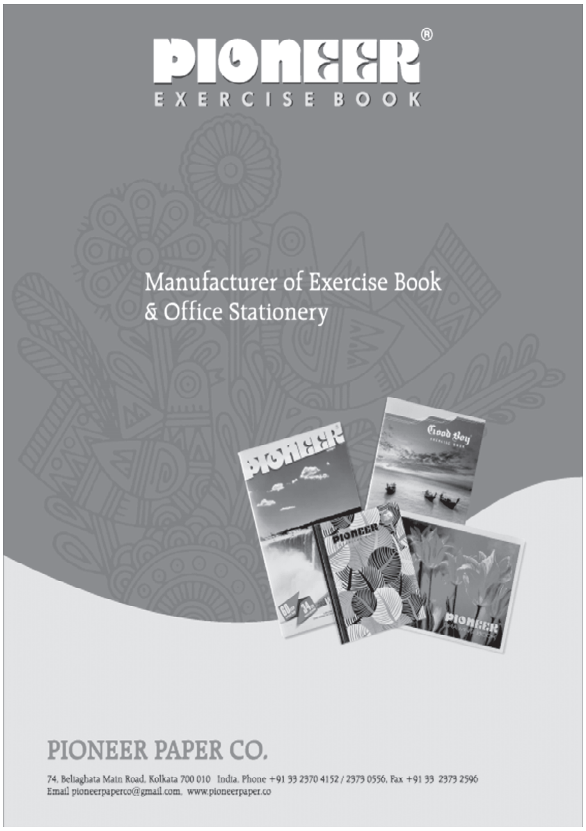

'যখন আমরা ভারতের সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, ভগবদগীতার বাণী পাঠ করি, তখন সেই মহাবুদ্ধিদীপ্ত মনীষার সম্মুখীন হই যা সমগ্র হিন্দু জীবন সম্বন্ধে অনুধ্যান করেছে। বুদ্ধের দয়া শত শত শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো মহত্তর বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু তাঁর অতিকোমলভাবে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়— শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সর্বদা প্রশান্ত, উদার এবং দৃঢ়ভাবে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

জঙ্গি ডেঙ্গি ও আন্ত্রিক

ডাঃ কিংশুক গোস্বামী

জঙ্গি শব্দটাই সমার্থক হয়ে উঠেছে ডেঙ্গি আক্রান্ত পরিবারের কাছে। দেশ কাল ও পাত্র বিচারে জঙ্গিরা যেভাবে নিজেদের পরিবর্তন ও আধুনিক করেছে সেইরকম ডেঙ্গি রোগ নিজেকে পরিবর্তন ও আধুনিক করছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। জীবাণুরা জিনের চরিত্র পাল্টে নতুন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

ডেঙ্গি ভাইরাস এডিস ইজিপাই নামক স্ত্রী মশা দ্বারা বিস্তার লাভ করে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জমা জলে জন্মানো এডিস ইজিপাই সকল বয়সের মানুষদের আক্রমণ করে।

লক্ষণ :

(১) সমস্ত দেহে বিশেষত জয়েন্ট (সন্ধি) পেশীতে প্রচণ্ড ব্যথা ও জ্বর, ২/৩ দিন পর জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার আসে দেহে লাল লাল ছোপ নিয়ে।

(২) এই সময় পাতলা পায়খানা হয়, শরীরে জল কমে যায়।

(৩) রক্তের শ্বেত কণিকা, প্লেটলেট কমে যায়। হেপাটাইটিস বি ও হার্ট বিট কমে যায়।

দমদমে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে ৮৪ জন, শ্রীরামপুরে ২৫৬ জন, কলকাতায় জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে ১১২ জন আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যে আক্রান্ত ২০১৫ সালে ২৮৪ জন, ২০১৬ সালে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৭৪৮ জন। মৃত ৬ জন। কিছুদিন আগে ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ছাত্রাবাসের পড়ুয়ারা ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথিতে সমস্ত রোগ লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। এই ক্ষেত্রে ফেরাম ফস, অ্যাকোনাইট, জেলস, বেলেডোনা দেওয়া যায়।

সচেতনতা :

১। আরো বেশি করে প্রচার চালাতে হবে। মশা যাতে জমা জলে না জন্মায় তা দেখতে হবে।

২। ইএলআইএসএ (এলিজা) টেস্ট বিনামূল্যে করা হয় সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে।

৩। জল স্থানগুলিকে সবসময় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

৪। ডেঙ্গি মশা পরিষ্কার জলে জন্মায় ও দিনে কামড়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

৫। গত ফেব্রুয়ারি উত্তম মঞ্চে 'ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া নিবারণে কী করা প্রয়োজন' বিষয়ক স্বাস্থ্য সেমিনারে কলকাতার ১৪৪ জন কাউন্সিলারকে আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও মাত্র ২০ শতাংশ উপস্থিত হন।

আন্ত্রিক

বর্ষাকালে যেসব রোগ দেখা দেয় তার মধ্যে 'আন্ত্রিক' সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির পেটের রোগ। এই রোগটি আন্ত্রিক না কলেরা তা নিয়ে চিকিৎসক মহলে দ্বিমত আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষকদের সরকারি সংস্থা 'নাইসেড' এই রোগের জীবাণু পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে দেখা যায় আন্ত্রিক বলে যাকে চালানো হচ্ছে তা আসলে কলেরা। World Health Organisation (WHO) বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে আন্তর্জাতিক মানচিত্র প্রকাশ করেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা ও হাওড়া ছাড়া আন্ত্রিকপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে অখণ্ড ভারতের আর কোনো শহর নেই। আন্ত্রিক আক্রান্ত রোগীদের দস্ত নমুনা পরীক্ষা করে 'ভিব্রিও কলেরিও ওয়ান' নামক কলেরা টকসিনের অস্তিত্ব পেয়েছেন।

গত বছর হাওড়াতে ও এই বছর বীরভূমের সাইথিঁয়াতে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রোগের কারণ :

(১) Vibrio Choleroe নামক জীবাণু এই রোগ সৃষ্টি করে।

(২) দূষিত জল।

(৩) আঢাকা খাবার ও রাস্তার কাটা ফল।

রোগের লক্ষণ :

১। প্রথমে কর্ণমূল গ্রন্থিতে বেদনা শুরু হয়, তারপর ভিতরে জ্বলতে থাকে।

২। আক্রান্ত স্থান ফুলে গিয়ে লাল হয়ে যায় সঙ্গে ব্যথা থাকে।

৩। ব্যথা ও ফোলা ভাব চোয়ালের নীচে ও গলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৪। কোনো কিছু গিলতে ও হাঁ করতে কষ্ট হয়।

৫। জ্বর আসে, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, ঘুম পায়, খিদে পায় না।

৬। ফোলা গ্রন্থি অনেক সময় পেকে যায়, পুঁজ হয়।

৭। হঠাৎ কর্ণমূল/কানের গোড়ার ব্যথা কম হয়ে পুরুষের অণ্ডকোষ ও স্ত্রীদের ওভারিতে ব্যথা বা প্রদাহ দেখা দেয়।

চিকিৎসা :

Mag. phos বা ফেরাম ফস।

পথ্য :

টক, ঝাল, বাসি খাবার নিষেধ। আক্রান্ত স্থান ফ্লানেল বা গরম বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রেখে গরম সেঁক দিতে হবে। ■

মালদায় বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে স্বেচ্ছা-রক্তদান শিবির

প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ১১ আগস্ট মালদহ জেলার বাচামারী গভঃ কলোনীস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায়-রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রলয় কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধি দল, শিশুমন্দিরের সভাপতি, অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ, প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার ক্ষুদিরাম বসুর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং উপস্থিত সকলকে এবং সকলের পরিবারকে ১১ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত স্বদেশী সপ্তাহ পালনের অনুরোধ করেন। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত চলে রক্তদান শিবির। এদিন শিশুমন্দিরের অভিভাবক-অভিভাবিকা, আচার্য-আচার্যা, প্রাক্তন বিদ্যার্থী-সহ মোট ৪৩ জন রক্তদান করেন। প্রধান আচার্য রক্তদানকারী সকলকে জনসেবা তথা লোককল্যাণকর কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জে গুরুবন্দনা উৎসবে শিক্ষক সম্মান প্রদান

উত্তর দিনাজপুর জেলার আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ, শিক্ষাদরদি ও সমাজকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এবং শিক্ষায় জাতীয়তাবাদী তথা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে এবছর তিনজন শিক্ষককে গুরুবন্দনা উৎসবে শিক্ষক সম্মান জানায় বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। গত ৭ আগস্ট রায়গঞ্জের দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠে গুরুবন্দনা উৎসবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মহারাজা জগদীশনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমল সরকার, ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সরোজকুমার ঝা এবং খোকসা বীণাপাণি তফশিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিদাস মণ্ডল

সমাবেশ সমাচার

মহাশয়কে। সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন, শিক্ষাদরদি ও সমাজকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই তিন শিক্ষককে সংগঠন থেকে প্রথম সম্মাননা জানানো হলো। অনুষ্ঠানে প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদহের কুশিদা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার। অনুষ্ঠানে সংগঠনের জেলা সভাপতি পুলকপতি ত্রিবেদী উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত শিক্ষকেরা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনকে এধরনের সম্মান জানানোয় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নদীয়া জেলায় শিক্ষক সম্মেলন

গত ৭ আগস্ট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নদীয়া জেলায় চাকদহ জোনাল কমিটির ব্যবস্থাপনায় চাকদহ পৌর সভার রবীন্দ্র সভাকক্ষে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় শিক্ষক সম্মেলন। জেলার ১৬টি হিন্দু মিলন মন্দিরের মাধ্যমে ৫২টি হাই/হায়ারসেকেন্ডারি স্কুল, ৪টি কলেজ, ২টি জুনিয়ার হাইস্কুল ও ২৯টি প্রাইমারি স্কুল থেকে মোট ২২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অধ্যাপক- অধ্যাপিকা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে এই শিক্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিখিল ভারত

হিন্দু মিলন মন্দিরের মুখ্য সংগঠক শ্রীমৎস্বামী গুরুপদানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অলোক ব্যানার্জি, মোহনপুর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অমিত কুমার চক্রবর্তী, কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতী রত্না ঘোষ কর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন সহ-শিক্ষা অধিকর্তা প্রাণেশ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন, চাকদহ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী মন্দিরা রায়, চাকদহ পুরসভার পৌরপতি দীপক চক্রবর্তী, উপপৌরপিতা সুকুমার রায়, কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রীতা পাল, জাতীয় শিক্ষক মনতোষ সরকার, ড. বিপুল পাল, অধ্যাপক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতা, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক বিপুল রঞ্জন সরকার ও প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার রায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি। সভায় বর্তমানে দেশের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা ও উচ্ছৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ শিক্ষকগণকে ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টির আহ্বান জানান। বক্তাগণ প্রায় সকলেই শিক্ষাঙ্গন ও সমাজে উচ্ছৃঙ্খলা ও দুর্নীতি রোধে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচলনের দাবি জানান। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই কাজে এগিয়ে আসায় বক্তাগণ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রশংসা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাতীয় শিক্ষক তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে চাকদহ জোনাল কমিটির আহ্বায়ক নির্মল চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা হিন্দু মিলন মন্দির কমিটির সম্পাদক ফণীভূষণ চক্রবর্তী।

শঙ্খনাদ সমরসতা মিশনের গীতাজ্ঞান প্রতিযোগিতা

গত ৩১ জুলাই গীতা প্রেস গোরক্ষপুরের মুখ্য কার্যালয় কলকাতায় গোবিন্দ ভবনের সভাকক্ষে শঙ্খনাদ সমরসতা মিশনের উদ্যোগে গীতাজ্ঞান প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে ৭০টি বিদ্যালয়ের ৩৮০০ ছাত্রছাত্রী গীতার জ্ঞান সম্পর্কিত প্রতিযোগিতায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে। ২০০ জন ছাত্রছাত্রী তাদের কুশলতা প্রদর্শন করেছে। করুণাময়ী গার্লস স্কুলের (ক্ষিরিসতলা, সোনারপুর) আর্সিদা খাতুন ওই অঞ্চলের প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করে। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞাপত্র প্রদান করেন।

ক্রীড়াভারতীর সর্বভারতীয় বৈঠক

গত ৫ ও ৬ আগস্ট ক্রীড়াভারতীর সর্বভারতীয় বৈঠক হয় নয়াদিল্লীর মধ্যাঞ্চল ভবনে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। তিনি বৈঠকে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাতে ক্রীড়াকেন্দ্র পরিচালনার যাবতীয় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াভারতীর অখিল ভারতীয় সভাপতি চেতন চৌহান, সহ-সভাপতি নারায়ণ সিং রানা এবং কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বেসরসারি উদ্যোগে ব্যাপক আকারে যোগদিবস পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বৈঠক পরিচালনা করেন ক্রীড়াভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক রাজ চৌধরী।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নগরের স্বয়ংসেবক অচ্যুতানন্দ ঘোষ গত ৭ জুন তাঁর পুত্র বিপ্লব ঘোষের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলাকার্যবাহ তরুণ নায়েকের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিপ্লব ঘোষ খাতড়া নগরের স্বয়ংসেবক।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক অমর্ত্য দাশগুপ্তের বাবা গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ৩০ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী নগরের স্বয়ংসেবক পার্থসারথি রায়ের মা নমিতা রায় গত ৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতার স্বয়ংসেবক বিশিষ্ট বক্ষ বিশেষজ্ঞ (Chest Specialist) ডাঃ প্রশান্ত সুকুলের পিতৃদেব ডাঃ গৌরীশঙ্কর সুকুল গত ৪ আগস্ট বীরভূম জেলার বাউটীয়াগ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ৩ কন্যা, ৩ জামাতা এবং নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

দাবার বিস্ময় প্রতিভা প্রজ্ঞানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিমার্জন নেগীর থেকেও কম বয়সে (১০) দাবা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছে চেন্নাইয়ের বিস্ময় প্রতিভা প্রজ্ঞানন্দ। বিশ্বদাবায় পাঁচ বছরের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রজ্ঞার ওপেনিং, মিডল ও এন্ড গেমে উদ্ভাবনী উৎকর্ষ ও থিওরির ওপর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে। বস্তুত আন্তর্জাতিক দাবায় আনন্দের স্বপ্নের উড়ান এদেশের দাবায় বিপ্লব সংগঠিত করেছে। আজ ভারতবর্ষে অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা গ্রান্ডমাস্টার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দাবা অলিম্পিয়াডে এই তো সেদিন ভারতের পুরুষ দল ব্রোঞ্জ পদক জিতে শক্তিশালী দেশ হিসেবে এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়েছে। বহু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ভারতের ছেলেমেয়েরা প্রথম দলের মধ্যে শেষ করছে। এশিয়ান টিম দাবায় তিন বৃহৎ শক্তি চীন, ভিয়েতনাম ও ফিলিপিন্স ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। এই ঐতিহ্য ও ঘরানার এখনও পর্যন্ত শেষ প্রতিনিধি প্রজ্ঞা।

আনন্দ ও বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নরওয়েের 'সুপার জিনিয়াস' ম্যাগনাস কার্ল সেন যথাক্রমে ১৫ ও ১২ বছর বয়সে পুরোদস্তুর আন্তর্জাতিক মাস্টার স্বীকৃতি পান। প্রজ্ঞা সেখানে ১০ বছরেই কেল্লা ফতে করে দিয়েছে। এখন দেখার পরিপূর্ণ গ্রান্ডমাস্টার সে কত বছরে হয়ে উঠবে। তবে সংবাদমাধ্যম ও দাবা তাত্ত্বিকদের ধারণা তার খেলার যা ধরন ও মৌলিক সৃজন তাতে আনন্দ ও নেগীকে টপকে যাবে। তবে শুধু গ্রান্ডমাস্টার হয়েই থেমে থাকলে চলবে না। প্রজ্ঞাকে বিশ্বমঞ্চে সগৌরব অবস্থান গড়ে নিতে হবে। এখন বেশ কিছু বড় শিল্পসংস্থা দাবার উন্নতিতে অর্থ লগ্নি করছে। তাই কর্পোরেট স্পনসরশিপের দৌলতে দাবা আজ ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতার সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রজ্ঞা যদি চিন্তা ও কর্মের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটাতে পারে স্বকীয় মেধা, মনন ও দক্ষতা তথা প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাহলে নিঃসন্দেহে বড় স্বপ্ন দেখা যায় তাকে নিয়ে। তবে তার জন্য দেশীয় দাবা সংস্থা ও স্পনসরদের সমস্ত রকম পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদেশে নিয়মিত আন্তর্জাতিক এক্সপোজার পেলে প্রজ্ঞা বিশ্বদাবার অমূল্যধন হয়ে উঠবে।

আধ্যাত্মিক গুরু প্রমুখস্বামী মহারাজের দেহাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু প্রমুখ স্বামী মহারাজ সম্প্রতি গুজরাটের বোটাড জেলার সারাংপুরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ছিলেন স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের সংগঠন বোকাসানওয়াসি অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার (বিএপিএস) প্রধান। প্রমুখ স্বামী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম শান্তিলাল প্যাটেল। তাঁর জন্ম ভদোদরার চানসাড় গ্রামে, ১৯২১ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৩৯ সালে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যখন বিএপিএস-র প্রমুখ ঘোষিত হন তখন তাঁর বয়েস মাত্র ২৮ বছর। ১৯৭১ সালে চতুর্থ গুরু যোগী মহারাজের পর তিনি আধ্যাত্মিক গুরুর কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যকালে তিনি প্রায় ১১০০ মন্দির নির্মাণ করান। তবে তার শ্রেষ্ঠ অবদান দিল্লীর গান্ধীনগরে সুবিশাল সংস্কৃতি কেন্দ্র স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম। ২০০০ সালে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের আমন্ত্রণে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং অসংখ্য শিষ্য রেখে গেছেন।

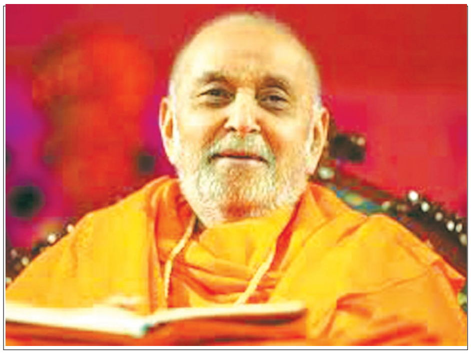

শোক সংবাদ

কলকাতা রাণীকুঠী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক কাজল রায় বর্মন গত ১২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দীর্ঘসময় তিনি ত্রিপুরা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর কলকাতায় এসে সঙ্ঘকাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও অগণিত বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

খেলাধুলোয় বাংলার মেয়েদের অগ্রগতি

গৌর ভট্টাচার্য

যে কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে একটা লক্ষ্য থাকা দরকার যার জোরে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও তাই। তা সে যে খেলাই হোক। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, জলক্রীড়া ইত্যাদি। এসব বিষয়ে যাঁরা মানুষের মনে দাগ কেটেছেন তাঁদেরই সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। তবে প্রথমেই চোখ থাকে বিদেশের দিকে। যেমন ক্রিকেটে স্যার ডন ব্রাডম্যান, গ্যারি সোবার্স। ফুটবলে সম্রাট পেলে, রাজপুত্র মারাদোনা। অ্যাথলেটিক্সে আবেবে বিকিলা, জ্যাটোপেক, পাঙোনুর্মি, কার্ল লুইস, ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার। টেনিসে বর্গ, রড লেভার, লেন্ডল, বেকার, নাভ্রাতিলোভা, স্টেফিগ্রাফ। ব্যাডমিন্টনে রুডিহরতলো, ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোন। সাঁতারে মার্কস্পিজ, স্বেনগোল্ড, ক্রিস্টিন অটো। দাবায় ববিফিশার, বরিস স্প্যাস্কি, ভিক্টর করশনয় প্রমুখ। কিন্তু ভারত খেলাধুলোয় আজ পিছিয়ে নেই। এদেশে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। যেমন— ক্রিকেটে রঞ্জিত সিংজী, মুস্তাক আলী, বিনু মানকড়, পঙ্কজ রায়, গাভাস্কর, তেন্ডুলকর। ফুটবলে গোষ্ঠপাল, চুনী গোস্বামী, পিকে ব্যানার্জী। হকিতে ধ্যানচাঁদ, কেশব দত্ত, ক্লডিয়াস। টেনিসে রমানাথন কৃষ্ণন, প্রেমজিতলাল, জয়দীপ মুখার্জি। সাঁতারে শচীন নাগ, আরতি সাহা, মিহির সেন। শুটিংয়ে ড. হরিহর ব্যানার্জী। অ্যাথলেটিক্সে মিলখা সিং, পরিমল সেন প্রমুখ। তাই দেখা যায় এঁদের অনুপ্রেরণায় যোগ্য উত্তরসূরিদের। যেমন— ক্রিকেটে সৌরভ গাঙ্গুলী, গোপাল বসু, শ্রীরূপা বসু, ঝুলন গোস্বামী, ফুটবলে মহম্মদ হাবিব, ইন্দার সিং, শ্যাম থাপা, বিজয়ন, হকিতে গুরুবক্স সিং, ভেস পেজ, অশোক কুমার, ইনামুর রহমান, টেনিসে বিজয় অমৃত রাজ, লিয়েন্ডার পেজ, বোপান্না, সানিয়া মির্জা, মহেশ ভূপতি। টেবিল টেনিসে কাবাড জয়ন্ত, রূপা মুখার্জি, ইন্দুপুরী, অরূপ বসাক। ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহাওয়াল, জ্বালা গুট্টা, সিন্ধু। দাবায় বিশ্বনাথন আনন্দ দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সূর্যশেখর।

অ্যাথলেটিক্সে পি টি উষা, এ ডি বালসম্মা, দীপা কর্মকার, স্বপ্না বর্মন। সাঁতারে উইলসন চেরিয়ান, বুলা চৌধুরী, শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী, ইলা পাল, চন্দনা সরকার, ঈশানী ঘোষ, সুপর্ণা পাল, সুপ্রিয় মণ্ডল, তনুকা ধাড়া। শুটিং-য়ে জয়দীপ কর্মকার প্রমুখ।

এ থেকে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে অন্য দেশের মতো এদেশের মেয়েরাও খেলাধুলোয় পিছিয়ে নেই। তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছেন। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষদের থেকে এগিয়ে। যেমন বর্তমানে ব্যাডমিন্টনে সাইনা, সিন্ধু, জ্বালাগুট্টা প্রমুখ বিশ্বখ্যাত। ফুটবলে ভারতের মেয়েরা মেয়েদের বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বের খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এদেশের পুরুষরা কিন্তু আজও বিশ্বকাপ ফুটবলে পৌঁছতে পারেননি। ভারতের মেয়েদের এই দক্ষতার প্রতিফলন বড় বড় ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আর এদের হাত ধরেই আসে সম্মান। যা সংগ্রহ হয় সুইমিংপুল থেকে সাঁতার, ওয়াটার পোলো, ডাইভিং হয়ে আবার কখনও টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট মারফত কখনও শূন্যে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল দেখিয়ে কখনও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঘুঁটির চাল দিয়ে কখনও স্বল্পসময়ে নির্দিষ্ট দূরত্বের দৌড় থেকে, কখনও উচ্চলম্ফনে কখনও দীর্ঘলম্ফনে। এসব ছাড়াও কবাডি, খো খো, ভলিবল ইত্যাদি থেকেও আসে সম্মান কম বয়সী থেকে সিনিয়রদের হাত ধরে। হয়তো আগের সেই স্বর্ণযুগের মতো নয়। কিন্তু সেই সম্মান কিছুটা হলেও ধরে রাখার প্রশংসনীয় প্রয়াস এরা চালিয়ে যাবে। আর এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন সেই ঝুলন গোস্বামী, মৌমা দাস, ঋতুপর্ণা দাস, শ্বেতা দে, তনুকা ধাড়া, স্বপ্না বর্মন প্রমুখের কথা অবশ্যই বলতে হয়। তবে এঁরা হয়তো সবার নজর কেড়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের আরও অনেক প্রতিভা দ্রুত উঠে আসছে যারা অচিরে নিজেদের চেনাতে সক্ষম হবে বাংলার সম্মান ধরে রাখতে এবং মেয়েরাও যে পারে তা প্রমাণে সফল হবে। ■

মৌমা দাস

ঝুলন গোস্বামী

ঋতুপর্ণা দাস

স্বপ্না বর্মন

শব্দরূপ-৮০১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২		■	৩	■	৪
■	■		■	■	৫		
৬	■	৭		৮		■	
৯			■		■	■	
	■	■	১০	■	১১		
	■	১২				■	
১৩			■	■		■	■
	■		■	১৪			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কৃষ্ণের শঙ্খ, **৫.** অনুসন্ধান, তল্লাশি, **৭.** পায়রা, কপোত, **৯.** দুধ হইতে মাখন তোলবার মন্থনদণ্ড, **১১.** সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস, **১২.** শান্তনু নন্দন ভীষ্ম, **১৩.** স্তম্ভাকৃতি চূড়া বা মন্দির, **১৪.** ‘‘আবার আসিব ফিরে—নদীটির তীরে’’।

উপর-নীচ : ২. ছাত্রবৃত্তি, **৩.** অভ্যস্ত সময়ে নেশা করার স্পৃহা, **৪.** রামায়ণোক্ত লতাবিশেষ যা শল্যব্যথা দূর করে, **৬.** কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে সাগরোত্থিতা দেবী, **৮.** ব্রাহ্মণ বালক, **১০.** সাধু, **১১.** বিবস্ত্র, উলঙ্গ, **১২.** শরৎকালীন।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৮
সঠিক উত্তরদাতা
সত্যবান মাহাতো
আদ্রা, পুরুলিয়া
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

■	উ	প	ল	■	গু	■	■
■	■	য়	■	■	লা	দা	খ
আ	■	ম	খ	ম	ল	■	ই
প	র্য	ন্ত	■	নু	■	■	ঢে
খো	■	■	আ	■	বা	র্তা	কু
রা	■	দ	ম	দ	মা	■	র
কি	ঞ্জ	ল	■	■	চা	■	■
■	■	মা	■	ধ	র	তা	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

□ ৮০১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

পাকিস্তানের অস্তিত্ব ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। পাকিস্তানকে আলাদা স্বাধীন দেশ হিসাবে মেনে নেওয়া ভুল হবে। এটা সেই মনোবৃত্তি ও পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করছে, যা ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে সমাপ্ত করে অন্য দেশের প্রতি নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। পাকিস্তানের নাগরিকরা ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভারতের ভূমি, জনসমুদায়, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ থাকবে না। সুতরাং পাকিস্তান হলো ভারতের পরাধীনতার অবশিষ্টাংশ। ওখানকার বন্ধুদেরকে ওই দাসত্ব থেকে মুক্ত না করলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ার মতো এটা সর্বদা আমাদের পীড়া দেবে।

* * *

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর শাসনকালে ভারতেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। এতে আমাদের লাভ হয়নি। কারণ এখন পর্যন্ত আমরা গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে সেই স্বরূপ ও বিবেচনার ভিত্তিতে ভাববার চেষ্টা করছি— যা দুটি বিচারধারাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বা সেই সম্পর্কিত সত্যের অভিব্যক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন আমাদের দৃষ্টিকোণ সংশ্লেষাত্মক হবে। পশ্চিমে বিকশিত গণতন্ত্রীয় সংস্থা ও পরম্পরাতে বা কার্লমার্কসের প্রকল্পিত ও লেনিন, স্ট্যালিন দ্বারা রাশিয়াতে প্রযুক্ত সমাজবাদে বানানো কাঠামোতে সম্পূর্ণ জীবনকে বাঁধা ঠিক হবে না। ভারতের জীবন এই দুই কল্পনার চেয়েও বড়। সুতরাং এই প্রচেষ্টাতে আমরা যতই টানাটানি করি— তাতে আমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে। ভারতে পশ্চিমি রাজনৈতিক চাপিয়ে দেওয়ার বদলে আমাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনকে বিকাশ করতে হবে। আমরা পশ্চিমি চিন্তনের দ্বারা অভিভূত হব না বা তাকে ধ্রুবসত্যও মানব না। এটা দেশ ও কাল দুই দিক থেকেই ঠিক।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৪

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - সমুদ্ভাষিত অনুত্তম
সুমিত্রা ঘোষ - শিরিণ
জিষ্ণু বসু - আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি

প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, অমলেশ মিশ্র, ড. তুষারকন্তি ঘোষ, রবিরঞ্জন সেন, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ।

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, এষা দে, সিদ্ধার্থ সিংহ, প্রবাল চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজ নারায়ণ রায়

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন

ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা

সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
22 August - 2016 - Rs. 10.00,